

চা-বাগানের কাহিনী

চা-কর

চা-বাগানের কাহিনী

চা-বাগানের কাহিনী

চা-কর

ক্যালকাটা পাবলিশার্স
১০, শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট, কলি-১২

প্রথম প্রকাশ
মহালয়া, ১৩৬১
প্রকাশক : মলয়েন্দ্রকুমার সেন
ক্যালকাটা পাবলিশার্স
১০, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট
কলিকাতা
মুদ্রাকর :
হরলাল বর্দ্ধন
বর্দ্ধন প্রেস
৮।৪এ, কাশী ঘোষ লেন
কলিকাতা
প্রচ্ছদ শিল্পী : রঘুনাথ গোস্বামী
প্রচ্ছদ-মুদ্রণ : নিউ প্রাইমা প্রেস

দু' টাকা

H102

যে-সব শ্রমিক চা-বাগানের অত্যাচার-কলঙ্কিত
মাটিতে জীবন আহুতি দিয়ে চা-শিল্পের
উন্নতিসাধন করে গেছেন তাঁদের
আত্মার কল্যানে

ভূমিকা

এককালে চা-বাগান বলতে রূপকথার সেই অন্ধকার নিষিদ্ধ দৈত্যপুরীর মতন একটা জগতকে বোঝাত, যার আভাস ছিল আমাদের মনলোকে, চোখের সামনে তার কোনো অবয়ব প্রত্যক্ষ ছিল না। শতেক রকম কাহিনী আমরা শুনতাম। শুনতাম, যে বাগানের রাজ্যটা সাদা-চামড়া ম্যানেজারের নিয়ম-কানুন মেনে চলে—দেশের শাসনের গণ্ডীর বাইরে ওটা। ওরা সেখানে 'আউট-ল'। সেখানে স্বেচ্ছাচার, অনাচার, নৃশংসতা, বন্যতা, বর্বরতা। অশিক্ষা এবং কুসংস্কার। মনুষ্যত্ব লাঞ্ছিত। চা-বাগানের শ্রমিক সম্বন্ধে নানা কথাও আমরা শুনেছি। তাদের জীবনের গ্লানি আমাদের পীড়িত করেছে। কিন্তু চা-বাগান বলতে ত শুধু শ্রমিক নয়, শ্রমিক মালিক সাধারণ কর্মচারী সকলকে নিয়ে, তাদের জীবনযাত্রা তাদের অভাব-অভিযোগ সুখ-দুঃখ মিশিয়ে যে পূর্ণাঙ্গ চিত্র তা-ই চা-বাগান। বাঙ্গালী অভিজ্ঞ লোকের মুখ থেকে যদি কোনোদিন এদের জীবন সম্পর্কে কিছু শোনা যায়, জানা যায়, তবে তাই হবে চা-বাগানের প্রকৃত পরিচয়—এমন ধারণাই ছিল আমার। সৌভাগ্যবশত বর্তমান পুস্তকের লেখক তাঁর রচনা 'দেশ' পত্রিকায় প্রকাশযোগ্য কিনা দু-পাতা উল্টে দেখবার জন্যে অনুরোধ

জানালেন। ত্ব-পাতা উল্টে দেখতে গিয়ে শেষ পাতাটি পর্যন্ত পড়ে ফেললাম। পড়া শেষ করে এক বিচিত্র জগতের ততোধিক বিচিত্র নরনারীর পরিচয় পেয়ে যতখানি না বিস্মিত হয়েছি মুগ্ধ হয়েছি তার অনেক বেশি। লেখক অভিজ্ঞ চা-কর। তাঁর জীবনের কর্মক্ষেত্রই চা-বাগান। উপরন্তু তিনি আদর্শবাদী, মানবিক গুণাগুণগুলির প্রতি সদা-সচেতন এবং শুভবুদ্ধি প্রণোদিত পুরুষ। স্বভাবতই তাঁর রচনা চা-বাগানের একটী সর্বাঙ্গীণ রূপকে পরিস্ফুট করবে এমন আশা আমি করেছি। বলা বাহুল্য, রচনাটি পরিধিতে সংক্ষিপ্ত। অল্প কথায় সমগ্র ছবিটি আঁকা হয়েছে—প্রায় একশ বছরের আসাম-কাছাড় অঞ্চলের চা-বাগানের বিবরণ এতে পাওয়া যাবে। আর পাওয়া যাবে চা-বাগানের সকল সম্প্রদায়ের সুখ-দুঃখের কথা, টুকরো টুকরো ছবি।

আশা করি চা-বাগান সম্বন্ধে কুতূহলী পাঠক এই বইয়ের মধ্যে এমন একটি জগত দেখতে পাবেন যা আর দৈত্যপুরীর মতন অন্ধকার নয়।

মহালয়া, ১৩৬১
কলকাতা

সাগরময় ঘোষ

অনেক দিন আগেকার কথা বলছি।

শিলচরে আমার মাতামহ সে-সময়ে ডেভিড্‌সন সাহেবের 'চা-বাগান এজেন্সি'তে সামান্য কেরাণীর চাকরি করতেন। তখন তাঁর আর্থিক অবস্থা অতি দীন।

তারপর হঠাৎ একদিন তাঁর জীবনের চরম পরীক্ষার দিন এলো।

তখন শিলচর ও সিলেটের মধ্যে রেলের যোগাযোগ ছিল না। যাতায়াত করতে হত নৌকাযোগে।

কাছাড়ের বড় বড় মোকদ্দমার বিচার হতো তখন সিলেটের আদালতে! ডেভিড্‌সনেরও একটি বড় মোকদ্দমা তখন সিলেটের আদালতে বিচারাধীন ছিল।

তাই সাহেব একদিন আমার মাতামহকে মোকদ্দমার সমস্ত বিষয় বুঝিয়ে দিয়ে বললেন, "তোমার যাতায়াতের জন্যে নৌকো ঠিক করাই আছে, আর এই নাও সাত হাজার টাকা। এর সবটা খরচ করতে হলেও মামলা জিতে আসা চাই। তোমার ওপর সম্পূর্ণ বিশ্বাস আছে বলেই এত বড় দায়িত্ব তোমাকে দিচ্ছি, কোন দিক দিয়ে কোন রকম কার্পণ্য করো না।"

দাদামহাশয় সিলেটে গিয়ে অর্দ্ধেক টাকা দিয়েই সে মামলা নিষ্পত্তি করলেন। কিন্তু এই সময় তিনি সিলেটে আছেন জানতে পেরে তাঁর মা আপন দৈন্য ও চরম দুর্দ্দশা জানিয়ে খবর পাঠালেন ছেলের কাছে! তাঁর মা তখন সিলেট থেকে পনর মাইল দূরে বসবাস করছিলেন। মায়ের এই আকুল আবেদন সন্তানের মনে আলোড়ন তুলবে এ আর বিচিত্র কি! তখনও মোকদ্দমার খরচ বরাদ্দ থেকে ৩৫০০৲ টাকা উদ্বৃত্ত হয়ে তাঁর জিম্মায় রয়েছে। অথচ মায়ের দুর্গতি ও নিজের অসহায়তা চিন্তা করে মনে চাঞ্চল্যের অবধি নেই। এই অন্তর্দ্বন্দ উচিত অনুচিতের প্রাচীর ভেঙ্গে চুরমার করে দিতে চাইছে। কি কর্ত্তব্য?

মনিবের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করে মায়ের দুঃখ দূর করার কর্ত্তব্য পালন, না নিয়োগকারীর বিশ্বাসের সম্মান রেখে চির-দুঃখিনী মাকে জীবনসংগ্রামে ক্ষতবিক্ষত অবস্থায় ফেলে রাখা?

অবশেষে বিবেকের জয় হল। অস্থির চিত্তে তিনি মাঝি-মাল্লাদের আদেশ দিলেন শিলচরের দিকে নৌকো ভাসাতে। মায়ের কাতর মুখ মনে উঁকিঝুঁকি মারা সত্ত্বেও দুর্বলতার ভয়ে এ যাত্রা মাকে দেখে যাওয়ার প্রবল আকাঙ্খা তাঁকে দমন করতে হলো।

শিলচরে পৌঁছেই তিনি সাহেবের সঙ্গে দেখা করে কিঞ্চিৎ উষ্মার সঙ্গেই বললেন, "মোকদ্দমায় আপনার জয়লাভ হয়েছে, টাকাও সাড়ে তিন হাজার উদ্বৃত্ত হয়েছে; সমস্ত বুঝে নিয়ে আমাকে বিদায় দিন। কারণ আমি আর চাকরি করতে চাইনা।"

আনুপূর্বিক সমস্ত ঘটনা শুনে ডেভিডসন সাহেব তাঁকে পাগলামি পরিহার করে কাজ করে যেতে অনুরোধ করলেন। কিন্তু দ্বিতীয়বার প্রলোভনের সম্মুখীন হলে হয়ত তিনি জয়ী হতে পারবেন না, এই সন্দেহ প্রকাশ করলেন দাদামহাশয়। তা সত্ত্বেও সাহাবের স্নেহ ও উপরোধ মত বদলাতে তাঁকে বাধ্য করল।

জীবনে যা কিছু সম্পদ, যা কিছু প্রতিষ্ঠা, যা কিছু প্রতিপত্তি তিনি অর্জন করেছিলেন, এই কঠোর পরীক্ষা থেকেই তার উৎপত্তি।

এই ঘটনা থেকে দাদামহাশয়ের অন্তরের পরিচয় পেয়ে ও চরিত্রের দৃঢ়তা দেখে সাহেব তাঁর বেতন বৃদ্ধি করলেন। আর গোপনে দাদামহাশয়ের নামে একটি তহবিল করে মাসে মাসে নিয়মিতভাবে কিছু কিছু টাকা গচ্ছিত রাখতে শুরু করলেন। দাদামহাশয়ের অজ্ঞাতে এই গচ্ছিত তহবিল নানা ব্যবসায়ে নিয়োজিত হয়ে উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেতে লাগল।

কয়েক বৎসর পর ডেভিড্সন সাহেব একটি যন্ত্র উদ্ভাবন করেন। পরে এই যন্ত্রই Sirocco Dryer নামে প্রসিদ্ধি লাভ করে। বেলফাষ্টে এই যন্ত্র নির্ম্মাণের কারখানা স্থাপন করার সিদ্ধান্ত করে ডেভিড্সন সাহেব একদিন ভারত ত্যাগ করতে মনস্থ করলেন এবং সে-কারণেই তিনি তাঁর সুপ্রতিষ্ঠিত ও সুবিশাল ব্যবসাটি হঠাৎ একদিন দাদামহাশয়কে বিক্রী করে যাওয়ার ইচ্ছা জানালেন।

বিস্ময়াবিষ্ট হয়ে দাদামহাশয় শুধু প্রশ্ন করলেন, "আমার সঙ্গে এ পরিহাসের কারণ কি? আপনার এ ব্যবসা কিনতে

যত টাকার প্রয়োজন তার সামান্য ভগ্নাংশও জোগাড় করা যে আমার পক্ষে সম্ভব নয়।"

সাহেব কিন্তু মনস্থির করে ফেলেছেন। তিনি বললেন, "তুমি শুধু কোন প্রকারে হাজার দুই টাকা সংগ্রহ কর, বাকী ব্যবস্থা আমি করে দিচ্ছি।"

সাহেবের প্রকৃত উদ্দেশ্য বুঝতে না পেরে কতকটা অবিশ্বাসের ভাব নিয়ে দাদামহাশয় অনেক কষ্টে দুহাজার টাকা এনে দিলেন। সাহেব তখন একখানা দলিলের খসড়া বের করে দেখালেন যে, তাঁর ব্যবসাটি তিনি দশ হাজার টাকা মূল্যে দাদামহাশয়ের কাছে বিক্রী করেছেন। দাদামহাশয় বিস্মিত হয়ে বললেন, "সে কি? আমি তো মাত্র দু'হাজার দিয়েছি!"

শুনে হাসলেন ডেভিড্‌সন সাহেব। তারপর দাদামহাশয়ের কাছে গোপন তহবিলের রহস্য উদ্ঘাটিত করে দেখালেন যে এই তহবিলে তাঁর নামে আট হাজার টাকা গচ্ছিত আছে। এরকম লাভবান ও লব্ধপ্রতিষ্ঠ ব্যবসায় তখনকার দিনেও যে-কেউ ২৫০০০৲ টাকায় কিনতে সহজেই স্বীকৃত হত। ডেভিড্‌সন সাহেব এ ভাবে তাঁর অধীনস্থ কর্ম্মচারীকে একরকম দানই করে গেলেন তাঁর চা-বাগান এজেন্সি! কত বড় মহৎপ্রাণ হলে অধীনস্থ কর্ম্মচারীকে প্রায় বিনামূল্যেই এরূপ একটি প্রতিষ্ঠান কেউ ছেড়ে দিতে পারে তা সহজেই অনুমেয়। আর দাদামহাশয়কে বলতে শুনেছি, পাছে তাঁর আত্মমর্যাদায় আঘাত লাগে কেবলমাত্র এই কারণেই সামান্য মাত্র মূল্য ধার্য করে সাহেব তাঁর দানের বাহ্য প্রকাশকে একটা আবরণে ঢাকা দিয়েছিলেন।

শ্রীহট্ট জেলার এক মধ্যবিত্ত বাঙ্গালী পরিবারে আমার জন্ম। আমার মাতামহ-বংশ মূলত শ্রীহট্টবাসী হলেও বহুকাল যাবৎ কাছাড় জেলার অধিবাসী হয়ে সেখানেই বসবাস করছেন। অল্প কিছুকাল ছাড়া ঐ উভয় জেলাই আসামের অন্তর্ভূক্ত ছিল।

উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগেই আসামে ব্যাপকভাবে চা-শিল্পের প্রসার হয়। ক্রমে তা শ্রীহট্ট ও কাছাড়ের সমতলভূমিতে ছড়িয়ে পড়ে। প্রকৃতির নানা সম্পদে সমৃদ্ধ আসামের শ্বাপদ-সঙ্কুল ও ম্যালেরিয়া অধ্যুষিত এই অরণ্যের অভ্যন্তরে এসে কত নেতা ও শ্রমিক যে চির-বিশ্রামলাভ ক'রে গেছেন চা-শিল্পের ইতিহাসের পৃষ্ঠায় তা স্বর্ণাক্ষরে লিখিত হয়ে থাকার যোগ্য। বস্তুত আসামের যা কিছু সম্পদ, যা কিছু ঋদ্ধি, যা কিছু গৌরব এই চা-কৃষিকে কেন্দ্র করেই গড়ে উঠেছে বললে একটুও অত্যুক্তি হবে না।

১৮৮৫ সাল পর্যন্ত এই শিল্প ইউরোপীয়দের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল।

যে সময়ের কথা বলছি সে সময় সাহেবরা পরবর্তীকালের মত অতটা উগ্র সাম্রাজ্যবাদী হয়ে ওঠেননি। উদার মনোভাব-সম্পন্ন সাহেবের আবির্ভাব সেকালে বিরল ছিল না। তাঁদেরই একজন এই ডেভিড্‌সন সাহেব। ডেভিড্‌সন সাহেব তাঁর অভিজ্ঞতা দিয়ে চা শুকোবার একটি যন্ত্র উদ্ভাবন করেন, যে যন্ত্রের কথা ইতিপূর্বেই বলেছি। তিনি উত্তর আয়ারল্যাণ্ডের বেলফাষ্ট নগরে এই যন্ত্র তৈরির একটি বিস্তৃত কারখানা করে উত্তরকালে সেখানে বসবাস করতে থাকেন। বলাবাহুল্য এই যন্ত্রটি চা-শিল্পে এক যুগান্তর আনয়ন করে। এবং এই

কারখানা এখনও বেলফাষ্টে বিরাট সাফল্যের সঙ্গে পরিচালিত হচ্ছে।

ডেভিডসন সাহেবের উদারতা ও পৃষ্ঠপোষকতা ভিন্ন আমার মাতামহের জীবনের নব অধ্যায় রচিত হওয়া অসম্ভব ছিল: কি পরিপ্রেক্ষিতে ও ঘটনা স্রোতের কি বিবর্তনে এটা সম্ভবপর হয়েছিল তার বিবরণ ইতিপূর্ব্বেই দিয়েছি। পরের গৃহে পাচক-বৃত্তি, অন্যান্য গৃহকর্ম্ম সম্পন্ন করে, নিজের গায়ে মাখার জন্য বরাদ্দ করা তেল বাঁচিয়ে, প্রদীপের সাহায্যে অধিক রাত্রি অবধি পড়াশুনা করে আমার মাতামহ তখনকার এণ্ট্রাস অবধি পড়েছিলেন ; কিন্তু পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে পারেননি—উত্তীর্ণ হলেন জীবনের এক চরম পরীক্ষায়।

সেই সময় থেকেই আমার মাতামহ পরিবারের সঙ্গে চা-শিল্পের প্রত্যক্ষ সম্পর্ক।

ছোট বেলায় যখন থেকে আমি আমার মার সঙ্গে মামার বাড়ী যাতায়াত শুরু করি, তখন আমার দানামহাশয় আসাম অঞ্চলে ব্যবসায় ক্ষেত্রে প্রচুর বিত্ত, খ্যাতি ও প্রভাব অর্জ্জন করেছেন। এমন কি কোন জটিল সমস্যার সমাধান করতে হলে জেলার উর্দ্ধতন কর্ম্মচারীরা তাঁর সাহায্য গ্রহণ করতেন। বাগান পরিদর্শন করতে বড় বড় ইংরেজ কোম্পানির অনেক ডিরেক্টর এই সময় বিলেত থেকে আসতেন এবং দাদামহাশয়ের সঙ্গে দেখা করে নিজের নিজের ব্যবসা ও বাগান সম্পর্কে তাঁর অভিমত ও পরামর্শ নিতেন। অন্য দিকে দাদামহাশয়কে কেন্দ্র করে কাছাড়ে একটি বলিষ্ঠ বাঙ্গালী সমাজ গড়ে ওঠে যার

পরিবেশ বাঙ্গালী যুবকদের স্বাধীন ব্যবসায়ের দিকে প্রবুদ্ধ করে। এর ফলে শিলচর ও সিলেটে কতকগুলি দেশীয় বড় বড় যৌথ প্রতিষ্ঠানের আবির্ভাব হয়। আর এই সময় থেকেই চা-কৃষির দিকে ভারতীয়রা আকৃষ্ট হয়।

দাদামহাশয়ের স্বাধীনচিন্তা ও দেশাত্মবোধ অত্যন্ত প্রবল ছিল। যখন সামান্য বেতনে ডেভিডসন সাহেবের কাজ করতেন তখন একদিন ঘুমের আবেশে কাজ করতে করতে হিসাবের খাতার উপর মাথা রেখে তিনি ঘুমিয়ে পড়েন। সাহেব তাঁর এই অবস্থা দেখে তাঁকে সতর্ক করার জন্য একটা খাতা দিয়ে তাঁর পৃষ্ঠে মৃদু আঘাত করেন। হঠাৎ নিদ্রার ব্যাঘাত হওয়ায় দাদামহাশয় উত্তেজিত হয়ে একটি মোটা বই নিয়ে সাহেবকে প্রত্যাঘাত করে বলেন "আজ থেকে তোমার চাকরীতে আমি ইস্তফা দিলাম।"

পরের দিন থেকে তিনি কাজে আসা বন্ধ করেন। তাঁর সাময়িক উত্তেজনা প্রশমিত হওয়ার সুযোগ দিয়ে দু'তিন দিন পর সাহেব নিজে গিয়ে অনেক সাধ্যসাধনা করে তাঁকে কাজে আসতে সম্মত করান। যে কালের কথা বলছি সে কালে ইউরোপীয় সমাজের উদ্ধত ও আত্মশ্লাঘার গর্বিত অংশবিশেষ শিক্ষিত দেশীয় সমাজকে কতকটা অবজ্ঞা ও কতকটা মুরুব্বিয়ানার চালে "নেটিভ" আখ্যায় অভিহিত করতেন। এবং দেশীয় সমাজ সেটাকে অপমানজনক বলে মনে করতেন।

এ নিয়ে যখন দাদামশায়ের সঙ্গে আলোচনা হত তখন তিনি বলতেন, "এতে তোমরা এত উত্তেজিত হও কেন? এক বিষয়ে অন্তত দেখা যায় যে, সাহেবরা আমাদের স্বাধিকার

মেনে নিয়েছে। আমাদের "নেটিভ" বলে তারা স্বীকার করছে যে আমাদের শিকড় ভারতবর্ষের মাটিতেই সুপ্রতিষ্ঠিত। আর তারা নিজেরা এখানকার পরগাছা ; সুতরাং এ পরগাছাকে একদিন সমূলে উপড়ে ফেলার সুযোগ আমাদের নিশ্চয়ই আসবে।"

তিনি যে শুধু কথাতেই এই যুক্তির সারবত্তা স্বীকার করতেন তা নয়, কাজেও তিনি তাঁর প্রতিষ্ঠিত সকল প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে "নেটিভ" যোগ করতে দ্বিধা করেননি। এই নেটিভ শব্দ সংযুক্ত হয়েই সেই প্রতিষ্ঠানগুলি সরকারী দলিলেও সমিতিভূক্ত হয়েছে। যারা উপরোক্ত ঘটনা সম্বন্ধে অজ্ঞ, এখনও তারা জিজ্ঞাসা করেন ঐ প্রতিষ্ঠানগুলির সঙ্গে "নেটিভ" যুক্ত হওয়ার তাৎপর্য কি ?

সাধারণত পারিপার্শ্বিক অবস্থা বালকচিত্তে ভবিষ্যৎ জীবনের অস্পষ্ট চিত্রলেখা প্রতিবিম্বিত করে।

শৈশবে বা বাল্যে আমার মামার বাড়ি যাতায়াত বিরল ছিল। যে দু একবার যাওয়া আসা করেছি তখন পর্যন্ত সুক্ষ্ম দৃষ্টি দিয়ে বিচার করা বা পারিপার্শ্বিক অবস্থার গুণাগুণ উপলব্ধি করার মত মানসিক উৎকর্ষতা লাভ আমার হয়নি। তবে সেই সময়ের একটিমাত্র ঘটনা, তার অনুভূতি চিরজাগরূক স্মৃতি নিয়ে পরবর্তীকালে আমার জীবনধারার উপর বিশেষ প্রভাব বিস্তার করেছিল। যে সময়ের ঘটনা সে-কালে চা বাগানের জন্য 'চুক্তিবদ্ধ শ্রমিক' প্রথায় 'আড়কাটির' সাহায্যে শ্রমিক সংগৃহীত হত। চলতি ভাষায় এদের বলা হতো 'গিরমিটি কুলী'।

গিরমিটি শব্দ শ্রমিকদের পরিভাষায় এগ্রিমেণ্ট-এর অপভ্রংশ বলেই মনে হয়। এই সব মজুর আইনত তিন বৎসরের জন্য চুক্তিবদ্ধ হয়ে আসত। কিন্তু চুক্তিনামার শর্তাদি সম্বন্ধে তারা ছিল অজ্ঞ। একবার চা বাগানের চতুঃসীমায় প্রবেশ করলে "গিরমিটি" চা শ্রমিকদের কাছে, তখনকার দিনে, বেরিয়ে আসার পথ চিরজীবনের জন্য বন্ধ হয়ে যেত। সে ছিল একধরণের যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর।

এমন অবস্থায় একদিন অন্দরমহলে খবর পৌছল যে একটি শ্রমিক মেয়ে তার শিশুপুত্র কোলে নিয়ে দাদামহাশয়ের দর্শন-প্রার্থী হয়েছে। শ্রমিক মেয়েটিকে দেখে সকলের মুখে বিস্ময়ের রেখা ফুটল। শ্রমিক মেয়েদের মধ্যে তেমন সুশ্রী মুখ, তেমন স্বাস্থ্যোজ্জ্বল চেহারা কমই দেখেছি। তাকে দেখে আমাদের ছোটদের মনে তখন কৌতুহলের সীমা নেই। আমার বয়স তখন সাত বছর।

ক্রন্দনরতা মাতার মুখের উপর নিবদ্ধ দৃষ্টি সেই মানব শিশুর আকুল অসহায় কাকুতি আমার ক্ষুদ্র হৃদয়ে যে আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল, কালের অপ্রতিহত গতিতেও হৃদয়তন্ত্রীর সেই রেশ নিঃশেষে লয়প্রাপ্ত হয়ে যায়নি।

ক্ষুদ্র দুটি নয়নের অব্যক্ত ভাষা আমাকে প্রবলভাবে আকর্ষণ করে থাকবে। আমার সমবয়স্কপ্রায় শিশুটিকে আমি আপন ভ্রাতাজ্ঞানে তার সাহচর্যলাভে ব্যাকুল হয়েছিলাম, যার ফলে মাতা পুত্র আমাদের পরিবারে আশ্রয়লাভ করেছিল।

মা ও ছেলে—দুটি প্রাণীর সঙ্গে আমার সম্বন্ধ যতই ঘনিষ্ঠতর হতে লাগল ততই সেই রমণীর অত্যাচারর্জ্জরিত আত্মার

ইতিহাস ও চা শ্রমিকদের দুঃখ পীড়িত ক্লান্তিকর জীবনের কাহিনী আমার কাছে উদ্ঘাটিত হতে থাকল।

বাড়ীর সকলেই সেই শ্রমিক মেয়েটিকে 'রাধা' বলে ডাকতো।

রাধার জীবনের পূর্ণ বিবরণ জানতে পেরেছিলাম অনেক পরে। বর্দ্ধমান জেলার কোনও এক গ্রামে, বর্ধিষ্ণু কৃষক পরিবারে তার জন্ম। পনর বছর বয়সে ঐ গ্রামেরই একটি যুবকের সঙ্গে তার প্রণয় হয়। অথচ তাদের বিবাহের প্রস্তাব প্রত্যাখান করলেন রাধার পিতামাতা। কিন্তু প্রণয় এমনই এক আসক্তি যে তার আকর্ষণ উপেক্ষা করা যায় না অনেক সময়। ফলে একদিন নিঃশব্দে তারা দুটি প্রাণী গৃহত্যাগ করে উধাও হ'ল। শাস্ত্রানুসারে বিবাহিত না হলেও তারা মনে প্রাণে স্বামী স্ত্রীর অধিকার মেনে নিয়ে একদিন রাঁচীতে গিয়ে উপনীত হ'ল। নতুন ভাবে ঘর বাঁধবার স্বপ্ন তাদের চোখে। কিন্তু প্রেমের নীড় বাঁধার জন্য প্রয়োজন অর্থের। তাই চাকরীর খোঁজ করতে করতে সেখানে আড়কাটির প্রলোভনে পড়লো ছেলেটি। আহার ও বাসস্থানের সংস্থান পেয়ে চা বাগানের শ্রমিক শ্রেণীভুক্ত হবার সম্মতি জানালো সে, এবং যথাসময়ে অন্যান্য চুক্তিবদ্ধ 'কুলীদের' সঙ্গে কাছাড়ের কোন একটি চা বাগানে তারা প্রেরিত হল। কিছুকালের মধ্যেই তাদের একটি পুত্র সন্তানও হল। কিন্তু সুখের যে স্বপ্ন দেখেছিল তারা, যে কল্পনার রঙে এঁকেছিল একটি মুগ্ধ প্রেমের নীড়, কোথায় মিলিয়ে গেল সে স্বপ্ন !

চা বাগানের নিকৃষ্ট ও গ্লানিকর আবেষ্টনীতে তাদের মনে নৈরাশ্যের সঞ্চার হল। তাই তারা দু একবার বাগান ছেড়ে পালাবার চেষ্টাও করে! কিন্তু কর্তৃপক্ষের নিযুক্ত হিংস্র অনুসরণকারীর দল প্রতিবারেই তাদের ধরে বাগানে ফিরিয়ে নিয়ে আসে। আর কর্তৃপক্ষের নির্দ্দেশে তাদের উপর শুরু হয় অকথ্য অত্যাচার। দ্বিতীয়বার পলায়নের প্রয়াস ব্যর্থ হওয়ার পর থেকে রাধার স্বামী হিতাহিত জ্ঞানশূন্য হয়ে সুরার নেশায় শান্তি খোঁজে। প্রথম প্রথম গোপনে ও পরে প্রকাশ্যে মদ্যপান আরম্ভ করে সে। নৈতিক চরিত্রের ক্রমিক অধোগতির সঙ্গে সঙ্গে মদ্য ও পরনারীর প্রতি ক্রমবর্দ্ধমান আসক্তি তাকে ব্যভিচারের চরম সীমায় পৌঁছে দেয়। এবং যে প্রেমিকা-স্ত্রীর জন্য একদিন সে সমাজ সংসার আত্মীয় স্বজন ছেড়ে অনির্দ্দেশের পথে যাত্রা করেছিল, সেই স্ত্রীর প্রতি অত্যাচার করতে সুরু করে!

চা বাগানের শ্রমিকদের কর্ম্মবণ্টনের ভার বাগানের বিশেষ এক কর্ম্মচারীর উপর ন্যস্ত থাকে। এমনই এক কর্ম্মচারী রাধার অঙ্গসৌষ্ঠব ও স্বভাব সৌন্দর্যে আকৃষ্ট হয়েছিল। আসল উদ্দেশ্য গোপন রেখে সে তাকে নিজের বাসায় গৃহকর্ম্মে নিযুক্ত করে।

লোকটি হয়তো ভেবেছিল, স্বামীর অনাচার এবং অত্যাচারে যে কোন নারীরই পদস্খলন হওয়া স্বাভাবিক। তাই খানিকটা সহানুভূতি দেখিয়ে রাধার মন জয় করার চেষ্টা করে সে, এবং তার প্রকৃত মনোভাব ব্যক্ত কর, মত্তপ ও ব্যভিচারী স্বামীকে ত্যাগ করে তার অঙ্কশায়িনী হতে অনুরোধ জানায়।

কিন্তু সব প্রলোভন উপেক্ষা করে রাধা অবজ্ঞার সঙ্গে এ প্রস্তাব প্রত্যাখান করে। এদিকে তার উদ্দাম যৌবনকে উপভোগ করার নেশায় লোকটি তখন প্রায় মত্ত। তাই তার মদ্যপ স্বামীকে প্রচুর মদ খাইয়ে ও নানা রকম ঘুষ দিয়ে তার উপর স্ত্রীর সম্মতি আদায়ের ভার দেয় সে। অধঃপতিত ও মর্যাদাজ্ঞানবিবর্জিত স্বামী প্রথমে যখন অনুরোধ, উপরোধ করেও স্ত্রীকে সম্মত করতে পারলো না, তখন শুরু করলো অত্যাচার! অত্যাচার করেও স্ত্রীকে স্বমতে আনতে অক্ষম হয়ে সন্তানের উপর প্রতিশোধ গ্রহণের ভয় দেখালো সে! সন্তারের জীবনাশঙ্কা দেখে রাধা কর্তৃপক্ষের কাছে কর্ম্মচারীটির বিরুদ্ধে অভিযোগ করলে।

কিন্তু সেখানেও কোন প্রতিকার না পেয়ে পলায়নের পথ অনুসরণ করতে বাধ্য হল। পালিয়ে যাওয়াও যে কত দুঃসাহসিকতার কাজ তা বুঝতো একমাত্র সে-যুগের চা-বাগানের কুলিরাই। আজকের দিনের মানুষ, বিশেষ করে শহুরে পাঠকদের কাছে তা হয়ত দুর্বোধ্য ঠেকবে। অবস্থা কতটা অসহনীয় হয়ে উঠলে এক নিঃসম্বল রমণী কর্তৃপক্ষের সারমেয় অনুচরদের শ্যেনদৃষ্টি বাঁচিয়ে শিশু সন্তানকে কোলে নিয়ে শ্বাপদসঙ্কুল ঘন অরণ্যের ভিতর দিয়ে নদী, নির্ঝর পর্ব্বত, কন্দর অতিক্রম করে নিরাপদ লক্ষ্যে পৌঁছানর ক্লেশ বরণ করে তা অনুমান করাও দুঃসাধ্য।

তিন দিন তিন রাত্রি আত্মগোপন করে নানা বিপদের মধ্য দিয়ে এগিয়ে চলেছে সে। প্রতিটি মুহূর্তই যেন মূল্যবান, প্রতি মুহূর্তেই যেন কেউ মৃত্যুর পরোয়ানা নিয়ে পথ রুখে

দাঁড়াবে, এই আশঙ্কা। শিশুপুত্রের কান্নায় পাছে তার অবস্থিতির সূত্র প্রকাশ হয়ে পড়ে, এই আশঙ্কায় এক পুঁটলি গুড় সঙ্গে নিয়েছিল সে। কখনো শিশুপুত্রকে স্তন দিয়ে, কখনো তার মুখে গুড় দিয়ে ছেলেকে চুপ করিয়ে রেখে দিনের পর দিন হেঁটে চলতে হয়েছে। সে-সময় কখনো গাছের নীচে বন্য জন্তুর গর্জন শুনতে শুনতে রাত কেটেছে। কখনো রাত্রির অন্ধকারেও ছুটতে হয়েছে।

এমনি এক ভীতি কাতর রাতে একটি গাছের নীচে শুয়ে ঘুমিয়ে পড়ে সে।

খুব সকালে কয়েকটি পার্ব্বত্য নগার কোলাহলে তার ঘুম ভাঙে। ভয় বিহ্বল চিত্তে সে তাদের দিকে তাকিয়ে সন্তানকে আঁকড়ে ধরে।

নাগাদের দৃষ্টি কিন্তু তখন তার রাত্রির উপাধানের দিকে নিবদ্ধ। গাছের মোটা শিকড় ভ্রমে অজগর জাতীয় (স্থানীয় ভাষায় চন্দ্রবোড়া) এক সাপের বৃহৎ দেহ যে তার উপাধান হয়েছিল বুঝতে পারে সে। নাগাদের দলের একজন ছুটে গিয়ে একটি লম্বা ও সুদৃঢ় লতা কেটে এনে সেই অতিকায় সাপটির লেজের দিকটা বেঁধে ফেলে এবং সকলে মিলে টানতে টানতে নিয়ে যায়, এবং রাধাকে তাদের অনুসরণ করতে ইঙ্গিত করে। অনন্যোপায় হয়ে রাধা তাদের আজ্ঞা পালন করে। তাদের উৎসাহ ও আনন্দের বহর দেখে ক্রমেই রাধার মনে ত্রাসের সঞ্চার হয়। তারা জঙ্গলের প্রান্তদেশে উপস্থিত হলে অদূরে পার্বত্য অধিবাসীদের মঞ্চাকারে নির্মিত বাসগৃহ দৃষ্টি-গোচর হয়। ওরা গ্রামে প্রবেশ করার পর বেশ একটা

চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয় ও সকলের চোখেমুখে উদ্দীপনার ভাব ফুটে ওঠে। গ্রামবাসীদের হর্ষের কারণ যে লতাবদ্ধ শিকার তাতে আর সন্দেহের অবকাশ থাকে না।

পূর্বোক্ত নাগাদের একজনের আদেশে রাধা ও তার পুত্রকে নিকটস্থ সুদৃশ্য এক মঞ্চাকার গৃহে নিয়ে যাওয়া হয় ও পার্বত্য কামিনীরা তাদের সাদর অভ্যর্থনা জানায়। তার পলায়নের কাহিনী ও কারণ তারা মনোযোগের সঙ্গে শ্রবণ করে। জনৈক পার্বত্য অধিবাসিনী তখন সম্মিলিত জনতার কাছে যায়। অনেক শিরশ্চালনার মধ্যে তাদের কি যেন পরামর্শ চলতে থাকে। পূর্ব পরিচিত নেতৃস্থানীয় সেই নাগাকে নিজের দিকে অগ্রসর হতে দেখে রাধার হৃদয় আশা নিরাশায় দোদুল্যমান হয়। কিন্তু নাগার মুখে শত্রুকবল থেকে তাকে রক্ষার দায়িত্ব গ্রহণ করার ও তাকে তার অভীপ্সিত নিরাপদ স্থানে পৌঁছে দেওয়ার আশ্বাস বাণী শুনে তার হৃদয় পুলকে ও কৃতজ্ঞতায় উদ্বেলিত হয়ে ওঠে। কৃতজ্ঞতার নিদর্শনস্বরূপ সে নাগা সর্দারকে পিতৃ সম্বোধন করে ফেলে। ইতিমধ্যে প্রাঙ্গণে লাঠি ও বল্লমের আঘাতে সেই বৃহদাকার সাপের পঞ্চত্বপ্রাপ্তি ঘটিয়ে তার কর্তিত উদর থেকে একটি মৃত মৃগশিশু টেনে বের করা হয়। সেই মৃগশিশুর উপরের দিকের অর্দ্ধেকটা হজম করার অবসর হওয়ার আগেই পাহাড়িয়াদের হাতে অজগরটির আয়ুষ্কাল নিঃশেষ হয়ে গিয়েছিল। পরে এই মৃগমাংস ও সর্প্প মাংস পাহাড়িয়াদের উদর-পূর্তির কাজে লাগে। উদরস্থ এই হরিণশিশুর কল্যাণেই মাতাপুত্রের জীবনরক্ষা পেয়েছিল। কারণ সর্পরাজের আর নড়বার ক্ষমতা ছিল না।

কিছুদিন সাদরে ও সযত্নে আপন গৃহে রাখার পর নাগা সর্দার তার প্রতিশ্রুতি অক্ষরে অক্ষরে পালন করেছিল। নাগা নারীর ছদ্মবেশ পরিয়ে সে রাধাকে শিলচর শহরে নিয়ে আসে ও কয়েকজন শহরবাসীর নির্দেশে আমার দাদামহাশয়ের সান্নিধ্যে হাজির করে।

এই নাগারা সমতলবাসীদের দুরধিগম্য বনাঞ্চলে পৃথক পৃথক দলে বিভক্ত হয়ে আসামের নানা স্থানে ছোট ছোট টিলায় 'জুম' প্রথায় চাষ করে থাকে। তারা স্বাধীনতাপ্রিয়, সভ্য জগতের রীতিনীতি, আচার-ব্যবহার, আইন আদালতের ধার ধারে না। তারা তাদের মনোনীত নেতাকে সর্বাধিনায়ক বলে মনে করে ও তার আদেশে পরিচালিত হয়। এক জায়গায় তারা একাদিক্রমে তিন বৎসরের বেশী বসবাস করে না, কারণ মাটি পোড়ান প্রথায় 'জুম' আবাদের চাষ হয় বলেই একই জায়গায় তিন বৎসরের বেশী তার উর্বরতা থাকে না। একই মাটিতে নানা রকম বীজবপন বা রোপণ করে ফসল জন্মান 'জুম' চাষের রীতি। ঘন ঘন স্থান পরিবর্ত্তনের প্রয়োজনে এই জাতীয় নাগাদের যাযাবর জীবনযাপন করতে হয়, কিন্তু চিত্তের স্বাধীনতা বা স্বাধীনতাপ্রিয়তা তারা কোন অবস্থাতেই বিসর্জ্জন দেয় না। তাই তখনকার রীতি অনুসারে শরণার্থী চা-শ্রমিককে বিশেষত স্ত্রী শ্রমিককে পুরস্কারের প্রলোভনে তার কর্তৃপক্ষের কবলে প্রত্যর্পণ করার প্রশ্ন নাগা সর্দারের মনে জাগ্রত হয়নি। অনেক সময়ই দেখেছি সভ্যতাগর্বিত সমতলবাসীদের পক্ষে স্বাধীনতার এই উপযুক্ত মূল্য দেওয়া বা প্রলোভন সম্বরণ করা দুরূহ হয়ে ওঠে।

যাই হোক্, আমারই আগ্রহাতিশয্যে মাতামহ পরিবারে

আশ্রয়লাভ করায় রাধার স্নেহ আমার উপরই সিঞ্চিত হতে থাকে। একাধিকবার দেখেছি যেখানে তার নিজের সন্তান ও আমার মধ্যে বালসুলভ সঙ্ঘর্ষের কারণ হয়ে উঠেছে, সেখানেই তার দৃষ্টি পক্ষপাতদুষ্ট হয়ে আমার স্বপক্ষে সমর্থন জানিয়েছে। এই স্নেহাধিক্য হেতুই হয়ত সে সেই পরিবারের পরিবেশ ছেড়ে অন্য কোথাও যেতে সম্মত হয়নি। বালকটির প্রতিও আমি আকৃষ্ট হই।

পোষাকে আশাকে, আদরে-আপ্যায়নে যখনই যার কাছে যা পেয়েছি, এই বালকের জন্যও সমান অংশ দাবি করে আদায় করে নিয়েছি। বালকের জননীও এই সংসারে সহৃদয় ও সমান ব্যবহার পেয়ে এসেছে। কিন্তু শুধু একটি বিষয়ে বালকটিকে আমি আমার সম্পূর্ণ অধিকার ছেড়ে দিতে পারিনি।

আমার একটি অতি প্রিয় 'ট্রাইসাইকেল' ছিল। এই বস্তুটির অধিকার নিয়ে আমাদের উভয়ের মধ্যে মাঝে মাঝে কলহের কারণ ঘটত। মাত্র এগারো বছর বয়সে আমার সেই নবলব্ধ বন্ধু এবং ভাইটির মৃত্যু হয় অকস্মাৎ। এবং তার মৃত্যুর পর থেকে আমার আজও অনুশোচনা হয়, তার ট্রাইসাইকেলে চড়ার আকাঙ্খার কথা মনে পড়লেই দুঃখ হয় আজও।

আজ জীবনের সায়াহ্নে যখন অভিজ্ঞতার সঞ্চয়-ভাণ্ডারে অন্তর্দৃষ্টি নিক্ষেপ করি, তখন ভাবি মানুষের এই সহজাত অধিকারবোধ জন্মের পর থেকেই মৃত্যু পর্য্যন্ত মানুষকে কি সঙ্কীর্ণতার দিকে টেনে নিয়ে যায়। একে কেন্দ্র করেই ব্যক্তি, সমাজ, জাতি ও বিভিন্ন দেশের মধ্যে দ্বন্দ্ব, কলহ, হিংসা, বিদ্বেষ ও যুদ্ধ বিগ্রহের সৃষ্টি হয়।

তাই বোধহয় শিশু যখন থেকেই মাতৃস্তন্য পান করতে শেখে, তখন থেকেই এই অধিকার-বোধ তাকে এক স্তনে মুখ ও অন্য স্তনে হাত দিয়ে স্বাধিকার রক্ষায় প্রবুদ্ধ করে।

আপন জন, কর্মচারী, আশ্রিতবৃন্দ নিয়ে আমাদের পরিবারের জনসংখ্যা ছিল আশি পঁচাশি জন। পরিচারকশ্রেণী ছাড়া সমস্ত পুরুষদের একসঙ্গে একই পংক্তিতে বাইরের মহলে ও সমস্ত স্ত্রীলোকদেরও ঐ একইভাবে অন্দরমহলে আহার করতে বসতে হত। স্নানে যাওয়ার সময় একবার ঘণ্টাধ্বনি হত ও দ্বিতীয়বার হত আহার্য প্রস্তুতের সঙ্কেতে। এই দ্বিতীয় ঘণ্টাধ্বনির সঙ্গে সঙ্গে সকলকে আপন আপন নির্দিষ্ট আসনে আহারের জন্য বসতে হত। এইটি ছিল নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপার। রাতে শুধু আহারের জন্য একবারই ঘণ্টা বাজতো। আমরা কিশোরের দল এতে আনন্দ উপভোগ করতাম এবং উৎসুক আগ্রহে এই ঘণ্টাধ্বনির প্রতীক্ষা করতাম।

মূল বাড়ির চতুঃসীমার বাইরেই একপাশে ছিল ব্যবসায় সংক্রান্ত সুবৃহৎ আপিসঘর, চা-বাগানে সরবরাহের জন্য রাখা চাল, চুন, কাপড় ও কয়লার বিশালায়তন কয়েকটি গুদাম। অন্যদিকে ছিল, আপন আপন গন্তব্যস্থানে যাত্রার সুবন্দোবস্ত না হওয়া পর্য্যন্ত বাস করবার উপযোগী, ইংলণ্ড প্রত্যাগত বা ইংলণ্ডগামী ইংরেজ পরিচালকদের জন্য সুদৃশ্য এক সারি বাংলো। এ ছাড়া ছিল এই সবের তত্ত্বাবধায়ক চৌকিদার এবং অন্যান্য পরিচালকদের কোয়ার্টার। দাদামহাশয়ের ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানে নিযুক্ত শ্রমিকদের আবাসগুলি সারিবদ্ধভাবে এদেরই সংলগ্ন ছিল।

এই সব শ্রমিকরা ছিল বেশীরভাগ দ্বারভাঙ্গা ও মজঃফরপুরের অধিবাসী।

এদের মধ্যে একটি সুন্দর প্রথা চালু ছিল। প্রত্যেকেই তারা দৈনিক রোজগার তুলে দিত সর্দ্দারের হাতে। মাসান্তে সর্দ্দারই তাদের খাওয়া খরচ বাদ দিয়ে ও টাকা প্রতি দুআনা সংরক্ষিত তহবিলে জমা করে উদ্বৃত্ত রোজগার শ্রমিকদের আপন আপন গ্রামের বাড়িতে পাঠিয়ে দিত। এই সংরক্ষিত তহবিল থেকে সর্দ্দারের প্রাপ্য নিয়ে বাকী যা জমা হত, তা দিয়ে কেউ পীড়িত হলে চিকিৎসার ব্যয় বহন করতো ও তাদের দেশে যাওয়ার খরচ সঙ্কুলান হত। সমবায় প্রথায় এই রোজগারের পথ আমার কাছে তখন খুব ভাল লেগেছিল। বন্টনের হার নিয়ে তাদের মধ্যে কোনদিন কোন বিরোধ বা মতানৈক্যের ভাব লক্ষ্য করিনি। সমস্ত মিলিয়ে দাদামহাশয়ের প্রতিষ্ঠানটিকে কেন্দ্র করে তখন একটি উপনগর গড়ে উঠেছিল। বর্তমানে এর প্রায় সবটাই নদীগর্ভে।

উপনগরের সকলের সঙ্গে আন্তরিক মেলামেশার ফলে একটা হৃদ্যতাপূর্ণ পারস্পরিক সম্বন্ধ গড়ে উঠেছিল। সকলের অভাব অভিযোগ সুখ দুঃখের কাহিনী আমাকে শুনতে হত, কারণ সকলেরই দৃঢ় ধারণা ছিল, আমি দাদামহাশয়ের ও দিদিমার দরবারে তা পেশ করলে প্রতিকার একটা হবেই। কিন্তু আমার তখনও বিচার বিশ্লেষণ করার বয়স হয়নি। কাজেই আবেদনকারীদের প্রার্থনা জানিয়ে নির্বিচারে মঞ্জুরের আব্দার জানাতাম। ন্যায্য গণ্য হলে তখনই প্রতিবিধান হত। অন্যায্য দাবীগুলি

অগ্রাহ্য করে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের অন্তর্নিহিত গূঢ় উদ্দেশ্য বুঝিয়ে দিয়ে দাদামহাশয় দিদিমা বলতেন, অন্যায়কারীদের প্রশ্রয় দিলে তারা শুধু অন্যায়ের পথেই চলতে থাকবে, সৎপথে তাদের মন কখনও ধাবিত হবে না। এই সব সংস্পর্শের ফলে একদিকে আমার অভিজ্ঞতা সঞ্চয় হচ্ছিল ও অন্যদিকে লোক-চরিত্র অধ্যয়নের সুযোগ এসেছিল।

এই একই কালে চা-বাগানের জন্য সংগৃহীত চুক্তিবদ্ধ 'গিরমিটি কুলীদের' সঙ্গে আমার প্রত্যক্ষ পরিচয় ঘটে।

টি ডিষ্ট্রীক্টস্ লেবার এসোসিয়েশন নামে একটি ইংরেজ পরিচালিত প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে চা-বাগানগুলির জন্য শ্রমিক যোগাড় হত। এই প্রতিষ্ঠান এখনও আছে, কিন্তু এর মূল নীতি ও কর্ম্মপদ্ধতির আমূল পরিবর্ত্তন হয়েছে। এই এসোসিয়েশনের প্রধান কার্যালয় কোলকাতায় থাকলেও ভারতবর্ষের সর্বত্র এর শাখা-প্রশাখা বিস্তৃত ছিল। শ্রমিক সংগ্রহেচ্ছু বাগানগুলি আপন আপন বাগান থেকে বিশ্বস্ত ও অনুগত লোকদের নূতন শ্রমিক সংগ্রহের জন্য তাদের স্ব স্ব অঞ্চলে পাঠিয়ে দিত। এই লোকদের বলা হত 'আড়কাটি' বা সর্দ্দার। আঞ্চলিক লেবার এসোসিয়েশনের শাখা কার্যালয়ের সঙ্গে এই সর্দ্দারদের সম্পূর্ণ সংযোগ রক্ষা করে চলতে হত। এইভাবে বিভিন্ন বাগান থেকে বহু সর্দ্দার চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ত। সংগৃহীত শ্রমিকদের জন্য স্থানে স্থানে শিবির তৈরী হত ও প্রত্যেক জেলার প্রধান নগরে সংগৃহীত শ্রমিকদের জন্য নির্দিষ্ট সমাবেশ-শিবিরে কঠোর প্রহরার আড়ালে নতুন রিক্রুটদের একত্র সন্নিবেশ করা হত। সেখান থেকে নির্দ্ধারিত দিনে

আসাম অঞ্চলের বাগানে বণ্টনের জন্য তাদের পাঠিয়ে দেওয়া হত বিভিন্ন কেন্দ্রে।

আমাদের উপনগরেও একটি কেন্দ্র ছিল। এইসব কেন্দ্র-শিবিরে সাধারণের অবাধ গতিবিধি ছিল না। তারা সতর্ক ও সজাগ প্রহরীদের দ্বারা সব সময় পরিবেষ্টিত থাকত। কিন্তু আমাদের আচরণ সন্দেহাতীত বিবেচনায় শিবিরে আমাদের পরিবারের লোকদের যাতায়াতে বিধিনিষেধ ছিল না। রঙরুটদের সঙ্গে আলাপ আলোচনায় এই শ্রমিক সংগ্রহ পদ্ধতির উলঙ্গ নিষ্ঠুরতা ও নির্মম নির্লজ্জতা আমি দেখেছি। এদের দুঃখপূর্ণ বিবৃতি আমাকে "টমকাকার কুটিরে"র কথা স্মরণ করিয়ে দিত। যে ইংরেজ তার মহানুভবতায় অনুপ্রাণিত হয়ে আমেরিকায় দাস-প্রথা উচ্ছেদের আন্দোলনের শিরোভাগে ছিল, ভারতবর্ষে স্বার্থ-প্রণোদিত হয়ে তারা এই একই প্রথার রূপান্তরকে সহ্য করেছে! ইতিহাসের এমন প্রহসন আজও আফ্রিকা ও অন্যান্য অঞ্চলে পুনরভিনীত হচ্ছে।

অবশ্য এক মহৎপ্রাণ ইংরেজ এ প্রথার পরিবর্তন প্রচেষ্টায় মনোযোগী হয়েছিলেন। এই উদারচেতা ইংরেজ হ'লেন স্যার হেনরী কটন। আসামের শাসনকর্তা থাকাকালীন একবার শিলচর পরিদর্শনে আসেন তিনি। তখন আমার দাদামহাশয় ও শিলচরের কয়েকজন বিশিষ্ট ব্যক্তি আসামের চা-শ্রমিক সংগ্রহের নীতি ও মানবাত্মার এই হীন অবমাননার তীব্র সমালোচনা করেন। স্যার হেনরী তাঁদের যুক্তির সারবত্তা উপলব্ধি করে এর প্রতিবিধানের প্রতিশ্রুতি দেন ও শিলংএ

ফিরে গিয়ে তিনি এ সম্পর্কে গভর্ণর জেনারেলের কাছে একটি স্মারকলিপি পাঠান। স্মারকলিপিটি ইংরেজ চা-কর মহলে একটি আলোড়নের সৃষ্টি করেছিল। ফলে ইংরেজ চা-করদের বিরাগভাজন হয়ে ইংরেজ শাসনকর্তাকেও গদিচ্যুত হ'তে হয়েছিল। আসামে তখন চা-করদের দোর্দণ্ড প্রতাপ। চা-শিল্প বা শ্রমিকদের সম্বন্ধে আইন-কানুন ইংরেজ বনিকদের স্বার্থবিরোধী হওয়ার কোন উপায়ই ছিল না।

চা-শ্রমিক রিক্রুট শিবিরে আসাম, বোম্বাই, পাঞ্জাব, উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত ও রাজস্থান ছাড়া ভারতের আর সকল প্রদেশের নিম্নশ্রেণীর সকল সম্প্রদায়ের লোককেই দেখতে পেতাম। অধিকাংশই অশিক্ষিত ও সমাজ কর্ত্তৃক অবজ্ঞাত। মাঝে মাঝে প্রলোভনের বশে দু'চারজন সম্ভ্রান্ত বংশীয় ব্যক্তিও যে এসে না পড়তো তা নয়। এই শ্রেণীর অনেক পরিবারকে দাদামহাশয় নিজের অর্থব্যয়ে 'আড়কাটিদের' কবল থেকে মুক্ত করে তাদের ইচ্ছানুযায়ী অন্যত্র মর্যাদাসম্পন্ন কাজ যোগাড় করে দিয়েছেন, না হয়ত আপন আপন দেশে ফেরৎ পাঠিয়েছেন। সংগ্রহকারী আড়কাটিরা কর্ম্মক্ষেত্র বেছে নিত দারিদ্র্যক্লিষ্ট ও বিশেষ করে দুর্ভিক্ষ পীড়িত অঞ্চলসমুহে। সেই সব অঞ্চলের অধিবাসীদের প্রলোভন দেখান হত যে চা-বাগানের কাজ শুধু চা গাছ নেড়ে পাতা কুড়ান ও দিনের শেষে প্রচুর পারিশ্রমিক পাওয়া ; চুক্তির তিন বৎসর কাটিয়ে 'সিন্ধবাদের' ধন দৌলত নিয়ে গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন ও জমি জমা কিনে বাকী জীবনের জন্য সুখে স্বচ্ছন্দে বসবাস। প্রতিশ্রুতির যাথার্থ্য প্রমাণ করবার জন্য চুক্তিবদ্ধ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে প্রত্যেককে নতুন কাপড় কম্বল, ঘটি,

থালা, চা-শ্রমিকদের রঙিন কোর্তা ও সামান্য কিছু অর্থ দেয়া হত। শ্রমিকরা এ সবকে উপঢৌকন মনে করে কৃতজ্ঞতায় অভিভূত হয়ে পড়ত, কারণ তখন তারা জানত না যে, এর মূল্য বাবদ প্রতিটি পাই বাগানের খাতায় তার নামে অগ্রিম ঋণের খাতে ধার্য হয়ে রয়েছে। এই ঋণ বাগানে পৌঁছানর পর তার বসতির ব্যয়বরাদ্দের অগ্রিম দাদনের সঙ্গে স্ফীত হয়ে হয়ে এমন আকার ধারণ করত যে, তিন বৎসরের পর দেশে ফেরার আশা তার চিরতরে বিলুপ্ত হত।

ভারতবর্ষের সামাজিক অবস্থা তখন এমন যে, দেশের শিক্ষিত সম্প্রদায় শহরের নানা প্রলোভনে আকৃষ্ট হয়ে গ্রাম পরিত্যাগ করে গেছেন ও এইসব অনুন্নত, অশিক্ষিত সম্প্রদায় ঔদাসীন্যের গুরুভার মাথায় নিয়ে অতি কষ্টে দিনাতিপাত করছে। তাদের নিয়ন্ত্রিত করবার মত উপযুক্ত লোক আর তখন গ্রামে অবশিষ্ট নেই। এই সামাজিক অবস্থার পরিবর্তন এখনও না করতে পারলে স্বাধীন ভারতের রামরাজ্যের কল্পনাও বিফলতায় পর্যবসিত হবে।

একবার দেশবরেণ্য নেতা স্বর্গীয় বিপিনচন্দ্র পাল মহাশয় করিমগঞ্জে তাঁর এক বক্তৃতায় চা-শ্রমিকদের সংগ্রহ-নীতি ও সাধারণ অবস্থা সম্পর্কে তীব্র সমালোচনা করায় সেখানকার কংগ্রেসের নেতৃস্থানীয় জনৈক দেশীয় চা-কর অভিযোগ করেছিলেন যে, বিপিনবাবুর ওরকম বক্তৃতা দেওয়া উচিত হয়নি। বিপিনবাবু প্রত্যুত্তরে ঠাট্টাচ্ছলে বলেছিলেন, "ভবিষ্যতে আমাকে আপনাদের প্রচার বিভাগের কর্তা করে নিয়ে আসবেন, আমি আপনাদের মনঃপুত বক্তৃতা দিয়ে যাব।"

সুতরাং দেখা যায়, শ্রমিকদের সম্বন্ধে, কি স্বদেশীয় কি বিদেশীয় চা-কর, সকলেই অনুরূপ দৃষ্টিভঙ্গীর পরিচয় দিতেন। বরং তাদের সঙ্গতির বলে ইউরোপীয়রা কাজ আদায়ের পক্ষে অবশ্য প্রয়োজনীয় কতকগুলি সুখ স্বাচ্ছন্দ্যের বিধান করতে সক্ষম হত।

এই সময় একটি কৌতুককর ঘটনা ঘটে।

সুরমা উপত্যকায় চা বাগানের ইউরোপীয় পরিচালকদের নিয়ে একটি অশ্বারোহী স্বেচ্ছাবাহিনী ছিল। বৎসরে একবার শিলচরে তাদের কুচকাওয়াজ হ'ত। বিস্তীর্ণ মাঠে তাদের অস্থায়ী শিবির শহরের শোভা বর্দ্ধন করত। সন্ধ্যার পর ক্লাবে তাদের অবাধ মদ্যপান ও হুল্লোড়ে সচকিত হ'য়ে উঠত শহরবাসীরা।

তিন চারজন ইউরোপীয় স্বেচ্ছাসেবক, চেহারার দিক থেকে যাদের দানব বললেও অত্যুক্তি করা হয় না, ঘোর মাতাল অবস্থায় একদিন স্খলিত চরণে বহির্ব্বাটীতে দাদামহাশয়ের অফিস ঘরে ঢুকে পড়ে। অন্য এক কামরায় আমাদের এক আত্মীয় তখন শুয়েছিলেন এবং শ্মশ্রু গুম্ফ শোভিত সেই ভদ্রলোককে দেখতে পেয়ে তারা সকলে একসঙ্গে তাঁকে গভীর আলিঙ্গনে প্রেমনিবেদন করতে থাকে। ভদ্রলোকের বিকট আর্তনাদে আমরা বাড়ির সকলে পড়ি কি মরি ক'রে আপিস ঘরে সমবেত হলাম। এসে দেখি, সাহেব পুঙ্গবরা সেই ভদ্রলোককে ঘন ঘন 'ডার্লিং' সম্বোধন করছে ও তাঁর গোঁফ দাড়ির উপর অজস্র চুম্বন বর্ষণ করছে। কাণ্ড দেখে আমরা স্তম্ভিত। সাহেবদের প্রেমের বন্যার গতিরোধ ক'রে শেষে আমাদের চৌকিদাররা গাড়ি ডেকে তাদের শিবিরে পৌঁছে দিয়ে আসে। পরে শুনেছিলাম, তাদের লক্ষ্যস্থল ছিল শহরের

গণিকালয়, কিন্তু মদের নেশায় তারা দিগভ্রান্ত ও অপ্রকৃতিস্থ হয়ে আমাদের আত্মীয়টির স্কন্ধে ভর করেছিল।

চা-বাগানের ইংরেজ পরিচালকদের চরিত্র ও রুচির খানিকটা পরিচয় পেয়েছিলাম সেই প্রথম।

আরেকটি ঘটনার কথাও এই সঙ্গে মনে পড়ছে। তার নায়ক ছিলেন আমার এক সহধ্যায়ী বন্ধু। আমি শিলচর আসার সময় আমার সহপাঠী দুই বন্ধু আসামের চা বাগান সম্বন্ধে তাদের কৌতুহল মেটাবার ইচ্ছা প্রকাশ করলেন। তাঁরা ছিলেন রাঁচী প্রবাসী বাঙ্গালী। পুরুষানুক্রমে তাঁরা রাঁচীর অধিবাসী। তখন পর্যন্ত তাঁদের গঙ্গা পার হওয়ার সৌভাগ্য হয়ে ওঠেনি। আমিই কাণ্ডারী হয়ে তাঁদের তো শিলচরে নিয়ে এলাম। কিন্তু তাঁরা আসাম সম্বন্ধে পূর্বেই কল্পনার তুলি দিয়ে মনে যে বিভীষিকার ছবি এঁকে রেখেছিলেন, তা কিছুতেই মুছে ফেলা সম্ভব হল না। প্রান্তরে কান্তারে আসামের নরখাদক বাঘ, পদে পদে ক্রূরগতি সাপ, পলকে পলকে নির্ম্মম হিংস্র পার্বত্য অধিবাসীর আবির্ভাব, এমন কি কুহকিনী মায়াবিনী কামাখ্যাবাসিনীও তাঁদের কল্পনা থেকে বাদ যায়নি।

আমরা তিন বন্ধু দুটি খাট একসঙ্গে জোড়া দিয়ে একত্রে শয়ন করতাম। যে দিনের ঘটনা বলছি, সেদিন বন্ধুদ্বয়ের মধ্যে একজনের একটু জ্বর হয়। রাত্রির অন্ধকার ও প্রত্যুষের অল্প আলো যখন আপন আপন অধিকার নিয়ে লুকোচুরি খেলছিল, সেই সন্ধিক্ষণে আমার রোগগ্রস্ত বন্ধুটি "চোর চোর" বলে হঠাৎ চীৎকার করে উঠল।

হঠাৎ ঘুম ভেঙে যাওয়ায় আমি স্তব্ধ হয়ে বিছানায় বসে চারিদিকে তাকাতে লাগলাম। বাড়িতে রাতে পাহারা দেওয়ার জন্য লোক নিযুক্ত থাকত বলে ঘরের দরজা-জানালা সবই ছিল উন্মুক্ত।

এমন স্তব্ধভাবে একটু সময় বসে থাকার পর খোলা দরজা দিয়ে আমি দেখতে পেলাম একটি লোক অন্দরমহল থেকে দৌড়ে পালিয়ে যাচ্ছে।

অস্পষ্ট আলোকে তখনও পলাতকের মুখাবয়ব দৃষ্টিগোচর হয়নি। সঙ্গে সঙ্গে একটি লাঠিহাতে লোকটার পিছু নিলাম। নদীর পারে এসে ঝোপের আড়ালে উপবিষ্ট একটি আবছায়া মনুষ্যমুর্ত্তি আমার দৃষ্টিপথে এল।

আমাকে দৌড়তে দেখে যারা আমার অনুসরণ করেছিল, তাদের আমি অঙ্গুলি সঙ্কেতে স্থানটির নির্দেশ দিলাম; কিন্তু তারা যখন সহাস্যে অপরাধীকে ঝোপের আড়াল থেকে বের করে নিয়ে এল, তখন আমিও হাসি সম্বরণ করতে পারলাম না। লোকটি আমাদের অতি বিশ্বস্ত একটি চৌকিদার। তার হাতে ঘটি দেখে আসল ব্যাপারটা অনুমান করলাম।

ইতিমধ্যে ঘরের ভিতর হুলুস্থুল কাণ্ড হয়ে গিয়েছে। আমার অপর বন্ধুটি চিৎকার শুনে আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে খাটের নীচে আত্মগোপন করেছিলেন, বোধ হয় তাঁর ধারণা হ'য়েছিল যে এবার আসামের বিভীষিকার সম্মুখীন হতে আর বিলম্ব নেই! চিৎকারে বিমূঢ় হয়ে সমবেত লোকজনের মধ্যে একজন হঠাৎ খাটের নীচে এক অস্পষ্ট মূর্তি দেখে "ঐ চোর ঐ চোর"

বলে তারস্বরে চেঁচিয়ে উঠল। অমনি চারদিক থেকে তার ওপর মার মার। নরহত্যা হয় আর কি!

কিন্তু আমার পীড়িত বন্ধু বীরপুরুষটিকে বিছানায় না দেখতে পেয়ে সকলকে প্রকৃত অবস্থা জানিয়ে মারধোরের হাত থেকে ভদ্রলোককে রক্ষা করেন।

এ ঘটনার দিন কয়েক পরই আমার বড় মামাবাবু এলেন শিলচরে। তিনি তখন দাদামহাশয়ের নেতৃত্বে প্রতিষ্ঠিত "নেটিভ" নামযুক্ত এক দেশীয় চা কোম্পানীর কর্তৃত্বাধীনে সুবিখ্যাত এক চা বাগানের পরিচালকের পদে অধিষ্ঠিত। দেশীয় ও বিদেশীয় চা-করদের মধ্যে তখন তাঁর খ্যাতি ও প্রতিপত্তি ছড়িয়ে পড়েছে।

এর আগে দেশীয় কোন ইংরেজী শিক্ষিত অভিজাত বংশীয় লোক আমাদের অঞ্চলে চা বাগানের পরিচালক হিসাবে কর্ম্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হননি। চা বাগানের চাকরীকে তখন লোকে অশ্রদ্ধার চোখে দেখত। ইংরেজ পরিচালকদের হাতে দেশীয় কর্ম্মচারীদের লাঞ্ছনার কাহিনীও তখন খুব বিরল ছিল না। এর জন্য চা বাগানের কাজে প্রচুর অর্থপ্রাপ্তির যোগ থাকলেও, লোকে একে কোন মর্যাদা দিত না এবং শিক্ষিত ও আত্মসম্মান-জ্ঞানসম্পন্ন লোক এর স্পর্শ বাঁচিয়ে চলত। এই পরিস্থিতির মধ্যেও বড় মামাবাবু যখন প্রতিবেশী ইংরেজ ম্যানেজারদের সঙ্গে সমান তাল ঠুকে তাদের প্রীতি ও সম্মান আদায় করে কাজ চালাতে লাগলেন, তখন অপূর্ব পুলকে ও গর্বে আমাদের মন ভরে উঠল। তাঁর প্রতি আমাদের শ্রদ্ধা বেড়ে গেল শতগুণ। তাঁর অলক্ষ্যে তাঁকে

আমরা 'সাহেব মামা' বলে ডাকতাম। তিনি একদিকে যেমন রাশভারী, অন্যদিকে তেমনি স্নেহপ্রবণ ছিলেন।

বাগানে ফিরে যাওয়ার সময় আমাকে সঙ্গে নিয়ে যাওয়ার প্রস্তাব করলেন মামাবাবু। আমার আহ্লাদের সীমা নেই, কারণ এর আগে কোন চা বাগানে গিয়ে থাকার সুযোগ হয়ে ওঠেনি। যদিও শিলচর আসতে যেতে রাস্তার দুপাশে চা বাগান দৃষ্টিগোচর হয়েছে। তখন মামাবাবুর বাগানে যেতে হত খানিকটা রেলপথে ও বেশীর ভাগটা নৌকাপথে। মোটর গাড়ীর প্রচলন তখনও সে অঞ্চলে হয়নি। তাই বাগানের সুদৃশ্য ও আরামদায়ক বজরায় নদীপথ অতিক্রম করার স্বপ্ন বিশেষ করে আমাকে মাতিয়ে তুলেছিল। মনে মনে এটুকু আশাও পোষণ করেছিলাম যে, সর্দার মাঝিকে হাত করে নিশ্চয়ই মাঝে মাঝে হাল ধরবার আনন্দ উপভোগ করতে পারব।

যথাসময়ে মামাবাবু, মামীমা, মামাত ভাইবোন ও লোক লস্করদের সঙ্গে বাগানের পথে পাড়ি দেওয়া গেল। আমার দুই বন্ধু স্বস্থানে ফিরে যাওয়ার সঙ্কল্প করায় আমি আর বাধা দিলাম না, কারণ তাদের মানসিক শৌর্য ও বীর্যের ইতিমধ্যে যা পরিচয় পেয়েছিলাম, তাতে তাদের শহর থেকে জঙ্গলের ভিতর টেনে নিয়ে যাওয়ার ভরসা আর পেলাম না।

ভোরবেলা রেলে শিলচর থেকে রওনা হয়ে আধঘন্টার মধ্যেই আমারা ছোট কাটাখাল ষ্টেশনে পৌঁছলাম। সেখানে মাঝি মাল্লারা বজরা নিয়ে আমাদের প্রতীক্ষা করছিল।

লুসাই পাহাড় থেকে একটা ছোট নদী নেমে এসে এখানে বরাক নদীর সঙ্গে মিশেছে। এই পার্বত্য নদীটির নামেই

রেল ষ্টেশনের নামকরণ হয়েছে কাটাখাল। এই নদীপথে প্রায় পঁচিশ মাইল উজান বেয়ে লক্ষ্যস্থলে বাগানে পৌঁছুতে হয়।

যথারীতি চা পান ও জলযোগ সমাধা করে বজরা ভাসান গেল। দু দিন ও একরাত নৌকায় কাটাতে হয়, সুতরাং বজরার সঙ্গে একখানা ডিঙ্গিনৌকা ছিল—রন্ধনাদি ও আহার্যের সাজসরঞ্জাম নিয়ে। দুই নদীর সঙ্গমস্থলে একটি বেশ বড় গঞ্জ বা বাজার। এ বাজার অতিক্রম করে খানিক দূর যাওয়ার পর থেকেই শুরু হল জঙ্গল ও ফাঁকে ফাঁকে বসতি-বিরল লোকালয়।

প্রথমদিন এই একই পরিবেশের ভিতর দিয়ে কাটল। রাত্রিবাসের জন্য নদীর মাঝখানে এক জায়গায় নৌকা নোঙ্গর করা হল। রাতের আহার সঙ্গে করে আমরা ভাই বোনেরা গল্প শোনার জন্য সর্দার মাঝিকে ঘিরে ধরলাম।

মাঝি তখন তার অভিজ্ঞতার ঝুলি খুললো। সে বললে, যে নদী দিয়ে আজ আমরা সমস্ত দিন ধরে নৌকা চালিয়ে এলাম, কিছুদিন আগেও নাকি এদিকে একা নৌকা নিয়ে যাতায়াত সম্ভব ছিল না, অনেকগুলো নৌকা একসঙ্গে সারিবদ্ধভাবে চলাচল করত তখন ও সন্ধ্যাবেলা একসঙ্গে দলবদ্ধভাবে নোঙ্গর ফেলে থাকত।

নদীর দুপারে যেসব গ্রাম দেখে এসেছিলাম তার অধিবাসীরা সব মণিপুরী। যুদ্ধে ইংরেজদের সঙ্গে হেরে গিয়ে তাদের পূর্বপুরুষরা জঙ্গলের ভিতর দিয়ে পালিয়ে আসে এবং সিলেট ও কাছাড়ের নানাস্থানে লোকচক্ষুর অন্তরালে বনেজঙ্গলে বসতি স্থাপন করে। তারা সুযোগ পেলেই

ডাকাতি করে ভরণ-পোষন চালাত। সঙ্গে সঙ্গে জঙ্গল কেটে চাষ আবাদও করত। আইজল যাত্রী রসদের ও চা-বাগানের মালবাহী নৌকাগুলি এদের আক্রমণের প্রধান লক্ষ্য ছিল। দুরান্তরের গ্রামগুলিতেও ডাকাতি করে এরা রাতারাতি জঙ্গলের ভিতর দিয়ে স্বস্থানে ফিরে আসত। যাতায়াতের দুর্গমতার হেতু এদের শাসন করাও এক কঠিন সমস্যা ছিল। পরে এদের এলাকায় সৈন্য শিবির স্থাপন করে এদের দিয়ে জঙ্গল কাটান হয় ও সরকার থেকে চাষের জমি বিলি ব্যবস্থা করে এদের সৎপথে আনার চেষ্টা চলে। এরা স্বভাবত দুর্ধর্ষ ও হিংস্র প্রকৃতির।

এদের বংশধরেরা, যাদের মাঝে মাঝে নদীর ঘাটে দেখতে পেয়েছিলাম গৃহস্থ হয়েও নাকি পূর্ব্বপুরুষের রক্তের ধারা একেবারে বদলাতে পারেনি। মাঝি বললে, বছর পাঁচেক আগেও এই মণিপুরীরা একজন দারোগা ও দু'জন কনষ্টেবলকে খুন করে তাদের মৃতদেহ গুম করে ফেলেছিল। এদের বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ টেকান মুশকিল হ'ত, কারণ এদের মধ্যে একতা এমন প্রবল যে, সাক্ষী জোটান দায়। হিংস্র জন্তু জানোয়ারই কি কম ছিল এই অঞ্চলে! প্রাণ হাতে নিয়ে চলতে হত।

আমি এক সময় বুড়ো মাঝিকে একান্তে পেয়ে তার নিজের চা-বাগানে আসার ইতিহাস ও শ্রমিক জীবনের অভিজ্ঞতার বিবরণ শোনাতে অনুরোধ করলাম। আমার ছোট ভাইবোনদের বজরার শয়নকক্ষে পৌঁছে দিয়ে বৃদ্ধ মাঝি চিন্তামগ্ন হয়ে কিছুক্ষণ বসে রইল। যেন তার স্মৃতি-কোঠায় নতুন ক'রে যে

আলোড়নের সৃষ্টি করলাম আমি, তার বেগ সংযত করতে তাকে বল সংগ্রহ করতে হচ্ছে।

আমি বললাম "মাঝি, তোমার যদি পুরনো কথা বলতে কষ্ট হয় তবে নাইবা বললে। এস আমরা এমনি বসে কথাবার্তা বলি।"

প্রবলভাবে মাথা নেড়ে মাঝি বললে, "হুজুর, আমাদের সুখ দুঃখের কাহিনী শুনতে এত আগ্রহ কেউ দেখায় না। আমরাও সে সুযোগ পাই না। ভগবান ও মানুষ আমাদের নিয়ে খেলা করছে, যেমন ছোট ছোট ছেলেরা বুদ্বুদ নিয়ে খেলা করে।" ব'লে সে দীর্ঘশ্বাস ফেললে।

ব্যথিত কণ্ঠে তার করুণ কাহিনী তার নিজের ভাষায় সে যা বললে তার সারমর্ম্মটুকু দিচ্ছি।

ডুমকার কাছাকাছি কোনও গ্রামে ছিল মাঝির পৈতৃক আবাসভূমি। জাতিতে ছিল সাঁওতাল। তার বাবা এক খেয়াঘাট পারাপার করে কায়ক্লেশে পরিবার প্রতিপালন করত। মাঝি কৈশোরে পদার্পণ করার পর থেকেই জনমজুর খেটে সংসারের সামান্য কিছু আয় বৃদ্ধি করত। পিতামাতার সে-ই ছিল জ্যেষ্ঠ সন্তান। ভাই বোন—এ দুটি প্রাণীর সঙ্গে ধীরে ধীরে তার এক স্নেহের বন্ধন গড়ে ওঠে। অকিঞ্চিৎকর আয়েরও অধিকাংশ সে ব্যয় করত তাদের উপঢৌকন ও প্রসাধনের পিছনে।

প্রকৃতির উন্মুক্ত কোলে লালিত পালিত এই মানুষটির ছিল অটুট স্বাস্থ্য ও অফুরন্ত স্ফূর্তি! হৃদয়ে বল, আর ভবিষ্যৎ আশার কল্পিত সুখের স্বপ্নে মশগুল ছিল সে।

মনের এই রঙ্গীন অবস্থায় গ্রামান্তরের একটি কিশোরী সাঁওতাল তরুণীর সঙ্গে তার সাক্ষাৎ হয়। মাঝি যেন তার 'মনের মানুষের' অবিকল মিল দেখতে পায় এই মেয়েটির মধ্যে। যুবকের আবেদনে মেয়েটি বিবাহ প্রস্তাবে সম্মতও হয়। কিন্তু গোল লাগল 'মনের মানুষের' পিতার অপ্রত্যাশিত দাবীতে। যুবকের সাধ্যাতীত অর্থ পণ দাবী করে বসল মেয়ের বাপ। অনুপায় হয়ে মাঝি মেয়েটিকে তার প্রত্যাগমনের অপেক্ষায় থাকতে বলে অর্থোপার্জনের চিন্তায় তুমকার দিকে রওনা হয়। সেখানে এক সুবেশ প্রিয়ভাষী লোকের সঙ্গে তার সাক্ষাৎ ঘটে। কথাপ্রসঙ্গে যুবকের আশা, আকাঙ্খা, প্রণয়িনীর সঙ্গে বিবাহ-বদ্ধ হওয়ার সর্ত, সমস্ত কথাই তার মিষ্ট ভাষণের সম্মোহনী শক্তি দিয়ে নিঙড়ে বের করে নিল লোকটি! চা-বাগানে অর্থোপার্জনের সহজ ও শ্রমহীন নানা উপায় সাঁওতাল যুবকের সামনে মেলে ধরলো সেই চতুর লোকটি।

অবশেষে তিন মাসের মধ্যে প্রয়োজনীয় অর্থ সংস্থান করে দেওয়ার প্রতিশ্রুতিতে সে মাঝিকে সংগ্রহ-শিবিরে নিয়ে আসে, সেখানে সে দেখতে পায় যুথবদ্ধ মেষের মত বিভিন্ন অঞ্চলের মেয়ে পুরুষ বিভিন্ন দলে বিভক্ত হ'য়ে ভবিষ্যতের স্বপ্নের জাল বুনছে। তাদের মুখে উৎসাহ উদ্দীপনার দীপ্তি দেখে মনে হল, ভবিষ্যৎ জীবন তাদের হাতছানি দিয়ে ডাকছে—দুঃখ দৈন্য ঝেড়ে ফেলে নতুন উজ্জ্বল জীবন বরণ করে নিতে। সকলকে নববস্ত্র পরিহিত দেখে মাঝির মনেও ভবিষ্যৎ সম্ভাবনার উজ্জ্বল রূপ ফুটে উঠল! লেবার এসোসিয়েশনের তকমা আঁটা তত্বাবধায়কদের সঙ্গে

যথাকালে তারা আসাম অভিমুখে রওনা হল। তার ডুমকার বন্ধুটিও তাদের সঙ্গে সঙ্গে চলল। পরে সে জানতে পেরেছিল লোকটি একটি 'আড়কাটি' অর্থাৎ চা-বাগানের শ্রমিক সংগ্রাহক।

এই আড়কাটিরা যত শ্রমিক সংগ্রহ করে মাথাপিছু তত পারিতোষিক পায়।

গল্প বলতে বলতে মাঝি একটু থামল। যেন পুরনো স্মৃতিটাকে ভাল করে ঝালিয়ে নিচ্ছে। তারপর বলে চলল তার যাত্রার কথা।

ছোট ছোট রেলের কামরায় ওপরে নীচে ঠাসাঠাসিভাবে বোঝাই করা হল সব শ্রমিকদের। মাঝির মনে পড়ল দেওঘরে একবার সে একটি গাড়ী দেখে—যাতে এইরকম করে গাড়ী-বোঝাই ছাগল ভেড়া নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল। প্রত্যেক কামরায় দরজার কাছে ছিল তকমাধারী তিনজন তত্ত্বাবধায়ক ও দুইজন করে আড়কাটি বা সর্দ্দার। তখন মাঝির মনে হয়েছিল যে, গাড়ীর আরোহীদের সুখ সুবিধার দিকে নজর রাখার জন্যই তাদের উপস্থিতি। পরে সে উপলব্ধি করেছিল, তাদের চালচলনের প্রতি তীব্র লক্ষ্য রাখাই ছিল তাদের মূল উদ্দেশ্য! যতই তাদের যাত্রা এগোতে থাকে ততই তত্ত্বাবধায়ক ও তার বন্ধুটির ব্যবহারে পরিবর্তন ঘটতে থাকে। কোন ষ্টেশনে গাড়ী থামলেই গাড়ীর জানালার শার্সিগুলি উঠিয়ে দেওয়া হ'ত। গাড়ীর দরজাও ছিল চাবি বন্ধ করা।

মোটের উপর জেলখানার কয়েদীকে স্থানান্তারিত করার সময়ে যে সতর্কতা অবলম্বন করা হয়ে থাকে, তাদের ক্ষেত্রেও অনুরূপ ব্যবস্থা ছিল। আহার্যের পরিমানও ক্রমশ

হ্রাস পেতে লাগল। কথায় কথায় ওদের ভীত সন্ত্রস্ত করে তুলল তাদের রক্তচক্ষু। মাঝে মাঝে সর্দ্দারদের লাঠির আস্ফালনও চলতে থাকল! কেউ কেউ অতিষ্ঠ হয়ে পালাবার ব্যর্থ প্রয়াস করে আত্মসমর্পণ করল অদৃষ্টের হাতে। আড়কাটির তুলির স্পর্শে মাঝির মনে ভবিষ্যতের যে রং ধরে এসেছিল, তা ক্রমশই ম্লান হয়ে আসতে লাগল। তবুও ক্ষীণ আশা—তিন মাসের কঠোর পরিশ্রমের পর প্রয়োজনীয় অর্থ নিয়ে দেশে প্রত্যাগমন করবে।

রেলের কামরায় ঠাসাঠাসি করে, কড়া পাহারায় মাঝির চা-বাগানের যাত্রার পথ শেষ হয়ে এল। মাঝি বললে, এ অবস্থায় তার পূর্ব পরিচিত বন্ধু অর্থাৎ আড়কাটির নেতৃত্বে তাকে আরো কয়েকজনের সঙ্গে শ্রীহট্ট জেলার করিমগঞ্জ ষ্টেশনে নামিয়ে নেওয়া হল! সেখান থেকে পায়ে হেঁটে পনর মাইল চলার পর তারা এসে পৌঁছল ইউরোপীয় পরিচালিত একটি চা-বাগানে। প্রহরী বেষ্টিত একটি কাঁচা ঘরে তাদের আনা হল রাত্রিবাসের জন্যে। পরদিন ভোরবেলা একটি খোলা যায়গায় লাইন করে দাঁড় করান হল সকলকে। সাহেব পরিচালক (ম্যানেজার) নাকি ওদের পরিদর্শন করবেন।

বেশ কিছুক্ষণ পরে বেতের ছড়ি হাতে ভীষণকায় একজন সাহেব বিরাটাকার দুটি কুকুর নিয়ে এসে উপস্থিত হলেন। এবং তাঁর চাবুকটা ঘোরাবার তালে তালে কুকুর দুটি লম্ফঝম্ফ দিয়ে নানা রকম মুখ বিকৃতি করে শ্রমিকদের মনে ভীতির সঞ্চার করতে লাগল। তারপর সর্দ্দারদের যথাযথ অনুজ্ঞা দিয়ে সাহেব কুকুর নিয়ে প্রস্থান করলেন। সঙ্গে সঙ্গে

মাঝিদেরও নির্দিষ্ট আবাসস্থলে নিয়ে যাওয়া হল। মাঝির মত অবিবাহিত পুরুষদের এক এক ঘরে ছ' জনের স্থান নির্দিষ্ট হ'ল। ঐ একই ঘরে রান্নাবান্না খাওয়াদাওয়া সবই করতে হবে। প্রথম অবস্থায় এই নবাগত শ্রমিকদের যথাসম্ভব পুরনো শ্রমিক-দের সংস্পর্শ বাঁচিয়ে রাখা হত। পুরনো শ্রমিকদের নতুনের প্রতি কোন কৌতূহলের ভাব দেখা যেত না। ওরা সবাই যেন কলে গড়া পুতুল, অদৃশ্য কোনও এক শক্তি যান্ত্রিক কায়দায় নিয়ন্ত্রণ করছে।

বাগানে আসার প্রথম এক সপ্তাহ কর্তৃপক্ষ শ্রমিকদের চাল ডাল ইত্যাদি সরবরাহ করলেন। তারপর সপ্তাহের রোজগারের অনুপাতে আহার্যবস্তুর পরিমাণের হ্রাস বৃদ্ধি হতে লাগল। মাঝির শরীর ও মন দুই ভেঙে পড়ল প্রতিকূল আবহাওয়ায় নতুন পরিবেশে ও অনভ্যস্ত কর্ম্মধারায়। তার উপর উদয়াস্ত পরিশ্রম করে যা রোজগার হয়, তাতে সঞ্চয় তো দূরের কথা নিজের উদরপূর্তি হওয়াই দুষ্কর। ফলে অর্ধাহার ও অনাহারে ক্ষীণবল হয়ে পড়তে হয়। ঘাড়ে কাজের যে ভার চাপান হয় তা শেষ করাও অসম্ভব হয়ে পড়ে।

অলসতার অপবাদে তাই তার উপর অত্যাচার শুরু হল। এই অবস্থায় সে যখন বাগান পরিত্যাগ করার অভিলাষ ব্যক্ত করল, তখন তার হিসাবে ব্যয়িত অর্থের যে অঙ্ক তার সামনে তুলে ধরা হল তাতে ইহজীবনে ঋণ পরিশোধ করে সে যে মুক্তিলাভ করতে পারবে না তা সে নিঃসন্দেহে বুঝলো।

মন হয়ে উঠল বিদ্রোহী। পলায়নের পথ খুঁজতে লাগল সে। ফলে সন্দেহভাজন হয়ে কঠোর পরিশ্রমের গুরুভারে

নিপীড়িত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আরম্ভ হল নতুন নতুন উৎপীড়নের পালা।

এক বৎসর এইভাবে কাটার পর সে জনৈক কর্ম্মচারীকে স্বদেশে তার বাবার নামে একখানা চিঠি লিখে দিতে অনুরোধ করল।

অশ্রুরুদ্ধ কণ্ঠে মাঝি বললে, "হুজুর, লেখা পড়া না শেখার দুঃখ আজ হাড়ে হাড়ে অনুভব করছি। জানিনা বাবাকে কি লিখে দিয়েছিল বা আদৌ বাবার নামে চিঠি লেখা হয়েছিল কিনা। কারণ সে চিঠির জবাব আমি আজও পাইনি। এখন তো বুঝি চা-বাগানের মজুরদের বাইরের জগতের সঙ্গে কোনরকম সংস্রব রাখার উপায় নেই। চিঠির জবাব যদি এসেও থাকে তো ম্যানেজারের হাত দিয়ে বড়বাবুর হাতে পৌঁছে সেখানে আগুনে পুড়ে তার সদ্গতি হয়ে থাকবে। চা-বাগানের গণ্ডীর ভিতর একবার ঢুকলে ইঁদুরের ফাঁদে আটক পড়ার মত অবস্থা হয়। সমস্ত ভুলে গিয়ে শুধু মুক্তির জন্যই লড়াই চলতে থাকে।"

চিঠির জবাব না পেয়ে মাঝির মন মুক্তির নানা রকম উপায় উদ্ভাবনে চঞ্চল হয়ে ওঠে। তার ওপর প্রখর দৃষ্টি শিথিল করার উদ্দেশ্যে সে সর্দ্দারের মনস্তুষ্টির জন্য সর্দারের স্বার্থ-পরিপূরক নানা কাজে নিজেকে ব্যস্ত রাখে। এতে একদিকে যেমন তার স্বল্প পরিশ্রমে আয়ের পরিমাণ বাড়তে থাকল, অপরদিকে তেমনি সর্দারের মধ্যস্থতায় হতে লাগল তার প্রতি কর্তৃপক্ষের সন্দেহের অপনোদন। সর্দারই শ্রমিকের রুজি রোজগারের নিয়ন্তা, কারণ তার ভালমন্দ রিপোর্টের উপরই

শ্রমিকদের দৈনিক পারিশ্রমিক নির্ধারিত হয়। একদিন সর্দারের শিথিল দৃষ্টির সুযোগ নিয়ে সে গভীর অরণ্যের পথে গা ঢাকা দিল পালানোর উদ্দেশ্যে। একদিন ও একরাত জঙ্গলে আত্ম-গোপন করে সে একটি গ্রামে এসে পৌঁছল। সেখানে এক সম্পন্ন গৃহস্থের আশ্রয় ভিক্ষা করল। কিন্তু তাকে দেখেই চা-বাগানের পলাতক শ্রমিক বুঝতে পেরে গৃহস্থ কপট সমবেদনায় তাকে আপ্যায়িত করল। দু' তিন দিন সেই গৃহে বাস করার পর গৃহকর্তা তাকে সঙ্গে করে ইউরোপীয় চা-বাগান সংলগ্ন একটি বাজারে নিয়ে গেল ও ষড়যন্ত্র করে তাকে সেই বাগানের কর্তৃপক্ষের কাছে ধরিয়ে দিল। সেখানে উৎপীড়িত হয়ে সে তার আসল বাগানের নাম প্রকাশ করতে বাধ্য হল। প্রহরী বেষ্টিত অবস্থায় তাকে আনা হল যে বাগানের কুলি সেই বাগানে। আবার শুরু হল অত্যাচারের পুনরাভিনয়, কিন্তু এবার নতুন পদ্ধতিতে।

কয়েকটি যুবতীকে নিযুক্ত করা হল তার মন আকৃষ্ট করার জন্য। যখন এইসব প্রচেষ্টা ব্যর্থ হল তখন একটি শ্রমিককে দিয়ে তার বিরুদ্ধে অভিযোগ উত্থাপন করা হল যে, "যাদু" করে শ্রমিকটির সহধর্মিণীকে সে নিজের প্রতি আকৃষ্ট করেছে ও শ্রমিক-গৃহিণী এখন আর নিজ স্বামীর প্রেমে সন্তুষ্ট না হয়ে মাঝির সঙ্গ লাভের জন্য পাগলিনী। তাকে নাকি অনেক কষ্টে স্বগৃহে আবদ্ধ অবস্থায় রাখা হয়েছে ও সে আকুল হয়ে মাঝির নাম উচ্চারণ করছে। সঙ্গে সঙ্গে বিচারের প্রহসন হল, তাতে প্রমাণিত হল মাঝিই দোষী। শাস্তি তিন দিন নির্জন বাস ও অনাহার। মানসিক উত্তেজনা ও দৈহিক অত্যাচারের

ফলে ভগ্নোৎসাহ হয়ে দিন দিন তার স্বাস্থ্য ভেঙ্গে পড়তে লাগল। অতীতের স্বপ্ন ও স্মৃতি কোথায় ভেসে গেল !

অবশেষে সুযোগ একদিন তার এল—আরো বছর তিন পর। অন্য একটি শ্রমিকের সঙ্গে সে বাগান পরিত্যাগ করে কিছুকাল জঙ্গলে জঙ্গলে ঘুরে একটি দেশীয় বাগানে এসে উপস্থিত হয়। এরপর দু' তিন বাগান ঘুরে ঘুরে তারা মামাবাবুর বাগানে এসে হাজির হয়।

মাঝি তার কাহিনী শেষ করে বললে—"হুজুর, বাগান থেকে বেরিয়ে এসে আর সাহস হল না পুরনো স্মৃতিকে নাড়াচড়া করতে। অনেকদিন হল দেশছাড়া। আমাকে তো আমার আপন-জনেরা হিসেবের খাতা থেকে বাদই দিয়ে দিয়েছে। কে আছে কে নেই তাও জানিনা। কাকে কি অবস্থায় পাব কিছুই ঠিক নেই। আমাকেই বা তারা কি ভাবে গ্রহণ করবে জানা নেই। এ অবস্থায়, হুজুর আপনিই বলুন আমার যাওয়া কি ঠিক হত? আমরা মুর্খ হলেও আমাদের মধ্যে প্রাণ বলে একটা পদার্থ তো আছে। এখনও যে বাপ-মা, ভাইবোনের স্মৃতি যে আমাকে মাঝে মাঝে পীড়া না দেয় তা নয়, তবে মার খেয়ে খেয়ে প্রাণ হয়ে গেছে পাথর। তাই এতে চারা গজায় না। বরং সংসার পেতে বেশ আছি। সাহেবও (মামাবাবু) যথেষ্ট স্নেহ করেন। তাঁর দরকারের সময় বজরার হাল ধরি, অন্য সময় তাঁর দেওয়া নৌকো জাল নিয়ে নদীতে মাছ ধরি। তাঁর প্রয়োজন মিটিয়ে যেটুকু উদ্বৃত্ত থাকে, অন্যের কাছে বিক্রী করে দু' পয়সা উপার্জন করি। কিছু জমি-জমাও করেছি। আশা আছে

শীগগিরই সাহেবের কাছ থেকে ছুটি নিয়ে বাগানের কাছে একটি বস্তিতে একখানা কুঁড়ে বেঁধে ছেলেপিলে নিয়ে বসবাস করব। চাষ-আবাদের অবকাশে ছেলেমেয়ে বৌঝিদের উপরি মজুরী খেটে দু'পয়সা ঘরে আনতেও কোন বাধা হবে না।"

গভীর নিস্তব্ধ রজনীতে, নদীর বুকে বজরার গায়ে মৃদু ঢেউয়ের করুণ সুর, নিগৃহীত মানবত্মার মর্ম্মান্তিক আর্ত্তনাদের প্রতিধ্বনি তুলে যে বিক্ষুব্ধ ভাবাবেগের সৃষ্টি করেছিল, তাতে বক্তা ও শ্রোতা দুজনেই কিছু সময়ের জন্য বিমূঢ় ও মুহ্যমান হয়েছিলাম।

সম্বিৎ ফিরে এলে মাঝিকে বলতে শুনলাম, "হুজুর! রাত অনেক হয়েছে। শুতে যান।"

পরের দিন বজরা কিছুদূর অগ্রসর হওয়ার পর বিক্ষত হৃদয়ে প্রলেপ দেবার জন্য প্রকৃতি দেবী পরিপূর্ণ উদারতায় তাঁর ঐশ্বর্যভাণ্ডার আমার নয়নপথে উন্মুক্ত করে দিলেন। নদীর একপারে মৃদু পবনহিল্লোলে তরঙ্গায়িত শ্যামল শস্যক্ষেত্র, অপর পারে বহুদূর বিস্তৃত সমতল চা-ভূমি। এত সুশৃঙ্খল ও সুচারু-ভাবে সন্নিবিষ্ট, যেন মনে হয় একখানা সবুজ গালিচার আস্তরণ। আরো দূরে ছোট ছোট পাহাড়ের উপর সবুজ তরুরাজি আকাশকে চুম্বন করে যেন আপন মহিমায় মহিমান্বিত। কোলাহল-মুখর শহরের বাইরে, জনবিরল প্রান্তরে এ দৃশ্য যে কি মাধুরিমাময়, তা এই প্রথম অনুভব করলাম। একের পর এক নানা দৃশ্যের পরিবর্তনের ভিতর দিয়ে গন্তব্যস্থানে এসে পৌঁছলাম!

মামাবাবুর প্রতি শ্রমিকদের সশ্রদ্ধ ভক্তি ও ভালবাসা-মিশ্রিত ব্যবহার আমাকে মুগ্ধ করেছিল। চা-বাগানের আড়ম্বরপূর্ণ জীবনযাত্রাও আমাকে কম মুগ্ধ করেনি। বিশেষত চারদিকের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য। প্রতিদিন দুপুরে বনজঙ্গলে ঘুরে বেড়াতাম এবং বিকেলে শ্রমিকদের আবাসে তাদের সঙ্গে নানারকম আলাপ-আলোচনা করতাম।

এই বাগানের অধিকাংশ শ্রমিকই দেখতাম স্থায়ী অধিবাসী হয়ে গিয়েছে এবং সুসংবদ্ধ পারিবারিক জীবন যাপন করছে। অবশ্য ব্যতিক্রমও এর মধ্যে দেখতে পাওয়া যেত। সকলেরই নিজস্ব কিছু কিছু চাষ আবাদ ছিল। কেউ কেউ দু'তিন পুরুষ যাবৎ চা-বাগানে আছে। চা-বাগান অঞ্চলে আসার মূল ইতিহাস সকলেরই প্রায় এক। সেই আড়কাটির প্রলোভন।

শ্রমিক সন্তানদের শিক্ষাদানের জন্য এখানে একটি প্রাথমিক স্কুল অনেকদিন থেকেই প্রতিষ্ঠিত ছিল। এই স্কুলেই লেখাপড়া শিখে একটি শ্রমিক সন্তান উচ্চইংরাজী বিদ্যালয়ের সপ্তম শ্রেণী পর্যন্ত প'ড়ে এই বাগানেরই একজন কর্ম্মচারী নিযুক্ত হয়। পরে অবশ্য প্রত্যেক চা বাগানে প্রাথমিক বিদ্যালয় রাখা বাধ্যতামূলক হয়েছে।

প্রতিবেশী ইউরোপীয় বাগানে গিয়েও আমি অবস্থা পর্যবেক্ষণ করতাম। সব সময়েই শ্রমিক ও পরিচালকের মধ্যে একটা ব্যবধানের প্রাচীর ছিল সেখানে। প্রাচীরের একদিকে উচ্চাভিমানের বড়াই ও অন্যদিকে আতঙ্ক ও আত্মমর্যাদার গ্লানি। অশিক্ষিত ও কুসংস্কারচ্ছন্ন শ্রমিকের অনভিজ্ঞতা বিজাতীয় পরিচালককে দেশী কর্ম্মচারীর উপর বেশী পরিমানে

নির্ভরশীল ক'রে তুলত এবং এই কর্ম্মচারীদের ব্যক্তিগত খুশি খেয়ালের উপর শ্রমিকের সুখ দুঃখ অনেকাংশে নির্ভর করত।

এইসব শ্রমিকদের সঙ্গে মিশে জানতে পারলাম আড়কাটির প্রলোভনে ভুলে কত স্বামী স্ত্রীপুত্রের কাছ থেকে, কত পুত্র ও কন্যা পিতামাতার আশ্রয় থেকে, কত প্রণয়ী প্রণয়িনী আপন প্রিয়জনের কাছ থেকে চিরতরে বিচ্ছিন্ন হয়ে এসেছে। কত পরিবার অর্থোপার্জনের মরীচিকায় বিভ্রান্ত হয়ে পৈতৃক ভিটে থেকে চিরতরে নির্বাসিত হয়েছে।

কিছুদিন বাগানে কাটাবার পর স্বপ্ন দেখলাম বয়ঃপ্রাপ্ত হয়ে চা-বাগানের পরিচালক হবো। বাল্যকালের সঙ্কল্পকে দৃঢ়তর করে আমি শিলচর ফিরে এলাম। ফিরে এসেই বজরার মাঝির বিবরণ দাদামহাশয়কে জানালাম।

তিনি বললেন, "আমাদের নিজস্ব দু'টি বাগানে যাতে "আড়কাটি" প্রথায় শ্রমিক সংগ্রহ না হয় ও শ্রমিকরা যাতে পণ্য হিসাবে গণ্য না হয়ে মানুষের মত ব্যবহার পায়, তার ব্যবস্থা করছি। অনতিবিলম্বে তিনি আমার মেজমামা ও ন' মামাকে এই মর্ম্মে চিঠি পাঠিয়ে দিলেন। তাঁরা আজও দাদামহাশয়ের আদেশ অক্ষরে অক্ষরে পালন করে আসছেন। এমন কি প্রতিবেশী কোনও এক বাগানের পলাতক এক শ্রমিক পরিবারকে আশ্রয় দান করে আমার ন' মামা বিপদ-গ্রস্ত হয়েছিলেন, তবুও সেই পরিবারকে আশ্রয়চ্যুত করেন নি। এই পরিবারকে ফিরিয়ে নেওয়ার জন্য প্রতিবেশী বাগান লোক পাঠায়, কিন্তু ন' মামা সম্মত না হওয়ায় সদলবলে সাহেব পরিচালক জোর করে আশ্রিত কুলিকে ছিনিয়ে নেবার জন্য বন্দুক হাতে

এগিয়ে আসেন। সে সংবাদ পেয়ে ন' মামাও বন্দুক নিয়ে বের হন ও দুই পক্ষেই গুলী চলে; কয়েকটি লোক আহত হয়। ন' মামাকে আসামী শ্রেণীভুক্ত করে ফৌজদারী মামলা হয়। এই মামলায় অনেক অর্থব্যয়ের পর তিনি মুক্তিলাভ করেন। সে ইতিহাস লেখা আছে সে দিনের সংবাদপত্রে, সরকারী দপ্তরে, আর হাজার হাজার শ্রমিকের আনন্দাশ্রুতে। এখানেই আমার চা বাগানের অভিজ্ঞতার দ্বিতীয় অধ্যায়ের পরিসমাপ্তি ঘটে।

প্রবেশিকা পরীক্ষার ফল প্রকাশিত হওয়ার পর আমি কোলকাতা এসে কলেজে ভর্তি হই। কলেজে পড়ার সময় গ্রীষ্মাবকাশে বছরে একবার শিলচর যেতাম। দাদামহাশয় তখন কর্ম্মজীবন থেকে অবসর গ্রহণ করে ধর্ম্মালোচনা নিয়ে দিন কাটাচ্ছেন। আমি গেলেই তিনি হিন্দুশাস্ত্র ও হিন্দুর আচারব্যবহার সম্বন্ধে নানা আলোচনা করতেন, হয়ত আমার মনের গভীরতা পরীক্ষা করার জন্য বলতেন, "তোমার মনে হিন্দুধর্ম্ম বা হিন্দুর আচার সম্বন্ধে সংশয় থাকলে আমাকে প্রশ্ন করতে পার।" কর্ম্মজীবনের অবসানের সঙ্গে সঙ্গে নিজের জন্য অতি সাধারণ একখানা ঘর তৈরী করিয়ে তিনি আর দিদিমা সেই ঘরে থাকতেন।

শিলচরে প্রতি বছর বর্ষাকালে বন্যায় তাঁর সেই ঘরে জল উঠত বলে আমার বড়মামাবাবু কতবার প্রস্তাব করেছেন, দোতলায় একখানা ঘর তৈরী করে নিতে, কিন্তু দাদামহাশয়কে কোন রকমেই সম্মত করাতে পারেননি। অগত্যা

সেই ঘরেই ইঁটের একটি উঁচু বেদী তৈরা করে ঘরের মেঝে রক্ষা করা হ'ত বন্যার আক্রমণ থেকে। এই কুটীরেই আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র প্রমুখ মনীষীদের সঙ্গে দাদামহাশয়ের নানাবিষয়ে আলাপ-আলোচনা হ'ত। আচার্য তাঁর এই আড়ম্বরহীন জীবন যাপনের উচ্চ প্রশংসা করতেন এবং এই ঘরেই বহু বৎসর পর প্রথমে দিদিমা এবং পরে দাদামহাশয় শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।

হাঁটুর উপর পর্যন্ত কাপড় পড়তেন তিনি। আহারেও খুব সংযমী হয়ে উঠেছিলেন। এই সময় তিনি প্রায়ই বলতেন, "মাটির সঙ্গে প্রেম করতে শেখো। মাটির সঙ্গে সংযোগ না রাখতে পারলে জীবন সংগ্রামে ক্ষতবিক্ষত হয়ে যাবে।" আরো বলতেন—"কি আহার বিহার, কি বসন ভূষণ, কি উচ্চাভিলাষ, সব দিক থেকে সংযম অভ্যাস করা দরকার। অসংযমী মানুষ নিজেও অসুখী হয়, অপরকেও দুঃখ দেয়।" এইসব উপদেশের মূল্য তখন সম্যক উপলব্ধি করতে না পারলেও এখন পারি।

১৯১৭ সালে কোলকাতার স্কটিশচার্চ কলেজ থেকে ভারত প্রতিরক্ষাবাহিনীর অন্তর্ভুক্ত 'কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় স্বেচ্ছাবাহিনী'তে আমি নাম লেখাই। সেই বছরেই মধুপুরে আমাদের শিক্ষাশিবির স্থাপন করা হয়। নেতাজী সুভাষচন্দ্রের সঙ্গে সেখানেই আমার প্রথম পরিচয়। যদিও "ওটেন" প্রসঙ্গ সম্পর্কে তাঁর খ্যাতি তার অনেক আগেই আমাদের কাছে পৌঁছে গিয়েছিল।

শিবিরে অন্যান্য প্রসঙ্গের সঙ্গে চা শ্রমিকের জীবন-প্রণালী, আড়কাটি প্রথা, শ্রমিকদের মধ্যে ব্যাপক অশিক্ষা ও

কুসংস্কার, তাদের ওপর কর্তৃপক্ষের অনুদার ব্যবহার ইত্যাদি বিষয় নিয়ে বিস্তৃত আলোচনাও হয়। কথায় কথায় আমি সেই রাধা ও মাঝির মর্মন্তুদ কাহিনীও ব্যক্ত করি। সব শুনে তিনি আমাকে পরামর্শ দেন, আমার সঙ্কল্প অনুযায়ী কর্ম্মজীবনে চা বাগানের কাজে লিপ্ত হয়ে থাকতে ও সাধ্যমত শ্রমিকদের কল্যাণকামী হয়ে কাজ করতে। এর পরে নেতাজীর সঙ্গে আমার দেখা হয় ১৯২৮ সালে কোলকাতায় জাতীয় কংগ্রেসের বিশেষ অধিবেশন উপলক্ষে। তিনি আমার পূর্ব্বসঙ্কল্প কাজে পরিণত করায় সন্তোষ প্রকাশ করেন। এই অধিবেশন উপলক্ষে নেতাজীর সর্ব্বাধিনায়কত্বে গঠিত অশ্বারোহী বাহিনীতে আমার দুটি মামাত ভাইকে আমি স্বেচ্ছাসেবকরূপে ভর্তি করিয়ে দিই।

১৯১৮ সালে, বি-এ পাশ করার পর, কর্ম্মজীবন বেছে নেওয়ার প্রশ্ন আমার মনে তখন উঁকি ঝুঁকি মারছে। তখন সবে বিশ্বযুদ্ধের শেষে আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়-স্বেচ্ছাবাহিনী ভেঙ্গে দেওয়া হয়েছে। এই স্বেচ্ছাবাহিনীর অপরাপর সৈনিকদের মত আমিও এই সময় ভারতীয় স্থায়ী সৈন্যবাহিনীতে কিংস্ কমিশনভুক্ত হওয়ার সুযোগ পেয়েছিলাম। কিন্তু আমার লক্ষ্য পূর্বেই ঠিক করা ছিল ব'লে আমি এ সুযোগ গ্রহণ করিনি। এছাড়া এই বাহিনীর সবাই যুদ্ধরত সৈনিকের সব অধিকার পাবে ও সরকারী নিয়োগ তালিকায় তাদের দাবী অগ্রগণ্য হবে বলে একটি সরকারী বিজ্ঞপ্তি ঘোষণা করা হয়। কিন্তু কোন লোভই আমাকে পূর্বসঙ্কল্প থেকে বিচ্যুত করতে পারেনি। শেষে শুভানুধ্যায়ী আত্মীয়স্বজনের অনুরোধ উপরোধ আমাকে বিব্রত

করে তোলে। তখন চা বাগানের কাজের বিরুদ্ধে শিক্ষিত লোকের একটি সংস্কার বর্তমান ছিল। বিশেষত বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রীধারী কোন শিক্ষিত যুবকের পক্ষে চা বাগানে যোগ দেওয়ার কথা কল্পনাতীত। ইতিমধ্যে তাঁর বাগানে শিক্ষানবিশীরূপে থাকার ইচ্ছা জানিয়ে আমি মামাবাবুর সঙ্গে পত্রালাপ করছিলাম তিনিও সম্মতি জানিয়ে চিঠি লিখেছিলেন। কিন্তু কতকগুলি কারণে সেখানে যাওয়া তখনকার মত স্থগিত রাখতে হয়। তখন আমি শ্রীহট্টে আমাদের পৈতৃক বাড়ীতে বাস করছিলাম। আসাম সরকারের মনোনয়নগুলি একের পর এক প্রত্যাখ্যান করায় সরকার সন্দেহ বশে স্থানীয় পুলিশকে আমার গতিবিধি লক্ষ্য করতে নির্দেশ দেন ও স্থানীয় সার্কেল অফিসারের উপর ভার পড়ে আমার সম্বন্ধে গোপনীয় বিবরণ পেশ করতে। অফিসারটি আমার বিশেষ বন্ধুস্থানীয় হওয়ায় তিনি আমার সঙ্গে পরামর্শ করে জানালেন যে, দাদামহাশয়ের নির্দেশ অনুসারে চা বাগানের পরিচালকের কাজ শেখার জন্য তাঁদেরই পরিচালিত এক বাগানে আমার কর্ম্মক্ষেত্র নির্দিষ্ট হয়ে রয়েছে। কাজেই সরকারের মনোনয়ন গ্রহণ করতে আমি অক্ষম।

আমি ১৯১৯ সালের শেষভাগে মামাবাবুর বাগান অভিমুখে রওনা হই। তখন ইউরোপীয় পরিচালিত কোন চা বাগানে সহপরিচালকের পদে শিক্ষানবীশ হিসাবে কোন ভারতীয়ের প্রবেশ অসম্ভব ছিল।

মামাবাবুর বাগানে এসে আমি কাজে যোগ দিলাম। আমার পদবী হ'ল "শিক্ষানবীশ সহকারী পরিচালক।"

বাগানের কর্ম্মচারীরা উপদেশ দিলেন যেন শ্রমিকদের সঙ্গে একটু পার্থক্য রেখে মেলামেশা করি। তাহলে শ্রমিকদের ভয় থাকবে।

প্রথম প্রথম কাজে বেরিয়ে টের পেলাম যে, আত্মাভিমান আমার কাজ শেখার পক্ষে প্রধান অন্তরায়। আমি অনুভব করলাম, এই আত্মাভিমান বিসর্জন দিয়ে শ্রমিকদের সঙ্গে মিলেমিশে হাতে কলমে কাজ না করলে আমার শিক্ষা অসম্পূর্ণ থেকে যাবে। বিশেষ করে তাদের কাজের ধারা সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল হতে না পারলে, চিরাচরিত কর্ম্মপন্থায় উন্নতি কিভাবে সম্ভব তার কোন ধারণা জন্মায় না। আমি যে লক্ষ্য নিয়ে আমার কর্ম্মক্ষেত্র বেছে নিয়েছি তা সফল করতে হলেও শ্রমিকদের সঙ্গে আমার অবাধ মেলামেশার বিশেষ প্রয়োজন। সুতরাং কর্ম্মচারীদের অযাচিত উপদেশ অগ্রাহ্য করে আমার কর্তব্য ঠিক করে নিলাম। আমাকে তাদের সমপর্যায়ে নিজ হাতে কাজ করতে দেখে শ্রমিকরাও আগ্রহান্বিত হয়ে আমাকে কাজ শেখাতে এগিয়ে এল। ইঙ্গিতে বোঝাতে চেষ্টা করতাম যে আমার শিক্ষার জন্য আমি তাদের উপর সম্পূর্ণ নির্ভরশীল। ইতিমধ্যে আমি চা শিল্পের উন্নতিকল্পে প্রতিষ্ঠিত টোকলাই গবেষণাগার থেকে প্রকাশিত পুস্তিকাগুলি খুব একাগ্রতার সঙ্গে পড়ে নিয়েছিলাম। শ্রমিকদের সাহায্যে, তাদের সঙ্গে আলোচনা করে এই পুস্তিকার নির্ধারিত ফলাফলেরও একটা পরীক্ষা চলতে লাগল। এতে যেমন আমার জ্ঞানোপার্জনের দিক থেকে যথেষ্ট লাভ হতে থাকল তেমনি

শ্রমিকদের আত্মমর্যাদা সম্পর্কে ধারণা জন্মালো, শ্রমের মর্যাদা দিতে শিখলাম।

বাগানের প্রাথমিক বিদ্যালয়েও হাত বাড়ালাম। আমি আমার মামাত ভাই দুটির সঙ্গে এর সংস্কারের ভার গ্রহণ করলাম। অবশ্য এ সবই হচ্ছিল মামাবাবুর সম্পূর্ণ অনুমোদনে। একজন আণ্ডার গ্রাজুয়েটকে নিযুক্ত করা হল প্রধান শিক্ষকরূপে এবং বাগানের দু'টি যুবক নিযুক্ত হল তার সহকারীরূপে। শ্রমিকদের অপরিণতবয়স্ক ছেলেমেয়েদের নানারকম উপঢৌকন দিয়ে ও প্রলোভন দেখিয়ে স্কুলে ভর্তি করা হল। পরিণত বয়স্কদেরও সুযোগ দেওয়া হল নাইট ক্লাশে ভর্তি হওয়ার। পরে এই বিদ্যালয়টি মধ্য ইংরেজী বিদ্যালয়ে পরিণত হয়েছিল।

শ্রমিক রমণীদের সমস্ত অভিযোগ, অভাব ব্যক্ত হত মামীমার কাছে। কি গভীর স্নেহে যে এদের সঙ্গে তাঁর ব্যবহার নিয়ন্ত্রিত হত তা প্রত্যক্ষদর্শী ছাড়া কারো বোধগম্য হতে পারে না। কত গোপন সাহায্য তিনি আমার হাত দিয়ে করেছিলেন তার হিসেব আমার পক্ষে দেওয়া অসম্ভব। আমি আজ মুক্ত কণ্ঠে স্বীকার করব যে, তাঁর মাধ্যমে যে প্রীতির সম্পর্ক, শ্রমিক ও কর্তৃপক্ষের মধ্যে, গড়ে উঠেছিল তা বাগানকে অনেক অপ্রীতিকর ঘটনা থেকে রেহাই দিয়েছে। আজও যদি এই শ্রমিক-মালিক বিরোধের দিনে মালিক ও উচ্চপদস্থ কর্মচারীদের স্ত্রী কন্যারা ভূয়ো মর্যাদাজ্ঞান ও আত্মাভিমান ভুলে গিয়ে তাঁদের কল্যাণ হস্তের সমবেদনার প্রলেপে শ্রমিক রমণীদের মর্মস্থল স্নিগ্ধ রাখতে অগ্রসর হন তবে অনেক কঠিন সমস্যার সমাধান হয়ে আসতে পারে।

অবস্থার তুলনামূলক বিচার করার জন্য আমি প্রতিবেশী ইউরোপীয় পরিচালিত বাগানের শ্রমিকদের সঙ্গেও সংযোগ রক্ষা করে চলতাম। সেখানে কর্তৃপক্ষ ও শ্রমিকদের মধ্যে টাকা আনার সম্বন্ধটাই অনুভূত হত বেশী, তা'তে হৃদয়ের কোন স্থান ছিল না, এখানে সম্বন্ধ নিয়ন্ত্রিত হত শুধু কাজের পরিমাপে। অত্যাচার উৎপীড়নের রূপ ছিল বিভিন্ন আকারের, কিন্তু উন্নততর উৎপাদনী শক্তির জন্য অর্থোপার্জনের সুযোগ ছিল দেশীয় বাগান অপেক্ষা বেশী।

১৯২০-২১ সালে যুদ্ধবিরতির ফলে জিনিশের দাম কমে গেল, সেই সঙ্গে চা-শিল্পেরও সঙ্কট দেখা দিল। এর পূর্বে ১৯১১ সালেও অনুরূপ অবস্থা ঘটেছিল।

১৯২১ সালে মহাত্মা গান্ধী শিলচরে পদার্পণ করেন। বিপুল জনতা তাঁকে সম্বর্ধনা জানায়। চা-শ্রমিকরাও দলে দলে এ সম্বর্ধনায় যোগ দেয়। মহাত্মাজীর আগমন তাদের প্রাণে এক অপূর্ব স্পন্দন জাগিয়ে তুলেছিল। তাঁর অসহযোগ আন্দোলনের খবর শ্রমিকদের মুখে মুখে এক বাগান থেকে অন্য বাগানে ছড়িয়ে পড়ল। বাত্যাবিক্ষুব্ধ তরঙ্গের মত বিশাল জনসমুদ্র হয়ে উঠল উদ্বেলিত। ইংরেজদের চা-বাগান ছেড়ে ইংরেজদের সঙ্গে অসহযোগ করার সঙ্কল্প নীড় বাঁধল শ্রমিকদের বুকে। মানবাত্মা ভৈরবনাদে গর্জে উঠল "ওরে ভীরু। ওরে কাপুরুষ! ভয় করো দূর। পুঞ্জীভূত অত্যাচারের প্রতিশোধ নাও ইংরেজের শোষণ বন্ধ করে, তার ধন অপহরণের পথ রুদ্ধ করে"!

গান্ধীজীর শিলচর ত্যাগ করার কিছুদিন পর দলে দলে

শ্রমিকেরা ইউরোপীয় মালিকানাভুক্ত চা বাগান থেকে বেরিয়ে আসতে লাগল। ইংরেজ পরিচালক ক্ষুব্ধ বিস্ময়ে তাকিয়ে রইল। মুক্তিকামীজনগণের মুখে দৃঢ় প্রতিজ্ঞার ছাপ। জনতার সঙ্ঘবদ্ধ আচরণ বলীয়ান দৃপ্ত উদ্ধত ইংরেজ বণিককে পক্ষাঘাতগ্রস্ত রোগীর মত নির্বাক নিস্পন্দ করে দিয়েছে। তার আস্ফালন, হুঙ্কার প্রতিপক্ষের নির্ভীকতার কাছে পদানত। বিপুল জনস্রোত প্রান্তর কান্তার দিয়ে অগ্রসর হতে লাগল। পথে পথে বাগানের শ্রমিকরা মিলিত হয়ে ছুটল লক্ষ্যের দিকে—রেল ষ্টেশন আর ষ্টীমারঘাটে। সেখান থেকে যাবে তারা আপন আপন দেশে, চাষবাস করে করবে পরিবার প্রতিপালন। "জয় মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধীর জয়" শব্দে গগন মুখরিত। প্রথম কয়েক দল শ্রমিক দেশে গিয়ে পৌঁছল। তার পরই দেশপ্রিয় যতীন্দ্রমোহনের নেতৃত্বে ও অর্থসাহায্যে সূচনা হল ষ্টীমার ধর্মঘটের। দেশপ্রেমে উদ্দিপ্ত ও মুক্তির সন্ধানপ্রাপ্ত শ্রমিক মেয়ে পুরুষ শিশু বৃদ্ধ নির্বিশেষে সকল দুঃখ যন্ত্রণা উপেক্ষা করে পদব্রজে তাদের অভিযান চালিয়ে যেতে লাগল লক্ষ্যের দিকে। এদের মধ্যে কতক আশ্রয় নিল দেশীয় বাগানগুলিতে, আর বাকী গিয়ে জমা হলো চাঁদপুর ষ্টেশনের বিরাট প্রাঙ্গণে ও তার আশেপাশে। সেখান থেকে যাদের সামর্থ্যে কুললো, তারা পাড়ি মারল দেশীয় নৌকায় আপন আপন দেশাভিমুখে। এই শ্রমিকদের মধ্যে বিহারী, বাঙালী, মাদ্রাজী, ওড়িয়া, সাঁওতাল, ওঁরাও, কোল, ভীল সব শ্রেণীর স্ত্রী পুরুষ ছিল। বাকী যারা চাঁদপুরে পড়ে রইল, তাদের উপর অত্যাচার চলল।

দিনের পর দিন ইংরেজ-পদানত দেশী ও বিদেশী হিংস্র সৈনিকেরা অহিংস জনতার উপর নির্ম্মম গুলি চালাল। দুঃখের বিষয় স্বাধীনতা সংগ্রামের অগ্রগামী এই শহীদদের উপযুক্ত মর্যাদা আজও আমরা দিইনি। যে শত শত নর-নারীর রক্তে চাঁদপুরের মাটি সেদিন রঞ্জিত আজ সেই চাঁদপুর পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত। যে অগ্রদূতের আত্মত্যাগের উপর আজ স্বাধীন ভারত ও স্বাধীন পাকিস্তান প্রতিষ্ঠিত তাদের প্রতি কি উভয় রাষ্ট্রের কোন কর্তব্য নেই? আজ স্মরণ করিয়ে দিতে ইচ্ছা হয় স্বাধীনতা সংগ্রামের শিল্পপতিদের দানের তুলনায় এই নিঃস্ব, নিরবলম্ব, বঞ্চিত শ্রমিকদের অবদান কত মহৎ? আমরা নিষ্ঠার সঙ্গে জালিয়ানওয়ালাবাগ দিবস পালন করে থাকি, কিন্তু চাঁদপুরের এই নির্মম হত্যাকাণ্ডের কথা সম্পূর্ণ বিস্মৃত হয়েছি।

আরও ক্ষোভের বিষয়, অসহনীয় দুঃখ যন্ত্রণার ভিতর দিয়ে স্বদেশ প্রত্যাবৃত শ্রমিকদের পুনর্বাসনের কোন ব্যবস্থা হল না। সঙ্গতিপন্ন যারা এসেছিল তারা বহু অর্থব্যয়ে স্বগ্রামে ও সমাজে নিজের একটু স্থান করে নিতে পেরেছিল। অবশিষ্টাংশ সমাজ স স্বজনের তাড়নায় গ্রাম ছাড়তে বাধ্য হলো।

স্বগ্রামে বা স্বদেশে স্থান না পেয়ে এই অভিযানকারী শ্রমিকদের অনেকেই অর্থোপার্জনের চিন্তায় চারদিকে ছড়িয়ে পড়ল। এদের মধ্যে অনেকেই নিজ নিজ চা-বাগানে ফিরে এল আসলো। এদের অনেকের সঙ্গে কর্মজীবনে আমার পরে সাক্ষাৎ হয়েছে। দেশে প্রত্যাবর্তনের প্রশ্নে তারা জবাব দিয়েছে, "গ্রামের যোগীর স্বগ্রামে ভিখ মিলে না।"

শ্রমিকদের এই জাগরণ ও সঙ্ঘবদ্ধতার প্রত্যক্ষ ফল শ্রমিকদের মন থেকে চা-বাগান কর্তৃপক্ষের প্রতি ভীতি ও বিভীষিকার ভাব দূর করে আত্মবিশ্বাস জাগ্রত করল। শ্রমিকদের একতার প্রভাব কর্তৃপক্ষকে বিচলিত করে তুলল ও অনাচার প্রশমিত হয়ে এল। কর্তৃপক্ষ শ্রমিকদের গতিবিধির উপর এতদিনের তীব্র দৃষ্টি শিথিল করতে বাধ্য হল। অবস্থার এই পরিবর্তনে শ্রমিকদের ব্যক্তি স্বাধীনতার মাত্রা একটু বাড়ল।

এই পরিস্থিতিতে একটি অভূতপূর্ব ঘটনা ঘটল। কোন এক বাগানের ইংরেজ সহকারী পরিচালক একটি শ্রমিক যুবতীর রূপে আকৃষ্ট হয়ে তাকে রক্ষিতা হিসাবে রাখবার প্রস্তাব করে। যুবতীটির নাম ছিল হীরা। সে তার বৃদ্ধ পিতামাতার সঙ্গে থাকত ও বাগানের কাজকর্ম্ম করে পরিবারের অন্ন সংস্থানের সাহায্য করত। সাহেবের এই কুপ্রস্তাব হীরা তার পিতামাতা ও অন্যান্য শ্রমিকদের নিকট প্রকাশ করে দেয়। কিন্তু বার বার প্রত্যাখ্যাত হয়েও সাহেবটি একদিন পানমত্ত অবস্থায় মেয়েটির বাসস্থানের সামনে গিয়ে "হীরা কাঁহা হায়" বলে চীৎকার করতে থাকে। তার এই চিৎকারে আকৃষ্ট হয়ে হীরার বাবা ও অন্যান্য কয়েকজন শ্রমিক ঘটনাস্থলে ছুটে যায়। সাহেবকে প্রকৃতিস্থ করতে না পেরে, তারা তাকে তার বাড়ীতে নিয়ে যাওয়ার জন্য তার গাত্র স্পর্শ করে। সাহেব উত্তেজিত হয়ে তার পিস্তলের গুলী ছোড়ে ও গুলীবিদ্ধ হয়ে সঙ্গে সঙ্গে হীরার বাবা মারা যায়। শ্রমিকদের বিস্ময় ও বিমূঢ় অবস্থার সুযোগ নিয়ে সাহেবটি পালাতে পথ পায় না। হীরা ও হীরার মা থানায় অভিযোগ করলে পুলিস তদন্তে

অপরাধী সন্দেহে সাহেব সদরে বিচারার্থ প্রেরিত হয়। কিন্তু ইংরেজ বিচারকের বিচারে সে, নির্দোষ সব্যস্ত হয়ে বেকসুর খালাস পায়।

শিলচরের একজন লব্ধপ্রতিষ্ঠ ব্যবহারজীবী সাহেবের পক্ষ সমর্থন করেন। তিনি তর্কের জাল সৃষ্টি করে বলেন, সাহেব এই দেশীয় ভাষায় অনভিজ্ঞ। অল্প কয়েক মাস হল তিনি বিলেত থেকে এসেছেন। তিনি "Hear road হ্যায়?" জিজ্ঞাসা করায় শ্রমিকরা ভুল করে ভাবল "হীরা কাঁহা হ্যায়?" এতে শ্রমিকরা উত্তেজিত হয়ে সাহেবকে আক্রমণ করে ও সাহেব আত্মরক্ষার জন্য পিস্তল ব্যবহার করেন।

যা হোক এই রায়ের বিরুদ্ধে আসামের তদানীন্তন শাসনকর্তা স্যার নিকোলাস বিটসন বেলের কাছে আপীল করা হয়। তাতে তিনি আদালতের রায় বহাল রেখে অভিমত করেন,—

It is unbelievable that a young Englishman fresh from Christian home is capable of doing such a heinous act.

অর্থাৎ ইংলণ্ডে খ্রীষ্টান পরিবারের আওতা থেকে সদ্য আগত একটি ইংরেজ যুবকের পক্ষে এরূপ ঘৃণ্য একটি কাজ করা সম্পূর্ণ অবিশ্বাস্য।

এই বেল সাহেবই অবসর গ্রহণের পর ভেক নিয়ে পাদ্রী সেজেছিলেন! পাদ্রীরই উপযুক্ত বিচার।

শিক্ষানবিশী শেষ হওয়ার পর ম্যালেরিয়ায় ভোগার পর আক্রান্ত হওয়ায় স্বাস্থ্য পুনরুদ্ধারের জন্য পশ্চিমাঞ্চলে এক বৎসর

আমাকে কাটাতে হয়েছিল। তারপর ১৯২৩ সালের মাঝামাঝি একটি দেশীয় যৌথ প্রতিষ্ঠানের কর্তৃত্বাধীনে শ্রীহট্ট জেলায় একটি বাগানের পরিচালক হিসেবে ভার পাই। এই প্রথম আমি আমার ইচ্ছানুযায়ী বাগান পরিচালনার সুযোগ পাই! এখানে এসে আমি দেখতে পেলাম জিনিসের দাম বাড়া সত্বেও শ্রমিকের দৈনিক পারিশ্রমিকের হার যুদ্ধপূর্বকালের হারের একই জায়গায় অপরিবর্তিত অবস্থায় রয়ে গেছে। শ্রমিকের প্রধান খাদ্য চালের তুলনামুলক মুল্য খতিয়ে দেখলেই যুদ্ধপূর্ব ও যুদ্ধোত্তর কালের জীবনযাত্রার ব্যয়ের তারতম্য সম্বন্ধে ধারণা জন্মাবে। যুদ্ধের আগে যে চালের মণকরা দাম ছিল তিনটাকা, যুদ্ধের পর তা এসে দাঁড়িয়েছিল পাঁচ টাকায়। অথচ পারিশ্রমিক —পুরুষ শ্রমিক দৈনিক চার আনা ও স্ত্রী শ্রমিক তিন আনা। দৈহিক পারিশ্রমিকের এই হারকে বলা হয় হাজিরা। প্রত্যেক হাজিরায় কাজের ধরণ অনুযায়ী কাজের পরিমাপ নির্দিষ্ট থাকে। কোন কোন পরিশ্রমী পুরুষ দুই হাজিরা, আবার অলস প্রকৃতির কোন কোন পুরুষ আধ-হাজিরার বেশী, রোজগার করতে পারত না। চা-গাছের পাতা তোলার কাজে কোন কোন স্ত্রী-শ্রমিক দুই হাজিরা পেত। কিন্তু বেশীর ভাগই আধা হতে এক হাজিরার মধ্যে থাকত। প্রথমেই আমি কর্তৃপক্ষকে লিখে মজুরীর হার বাড়াতে সমর্থ হলাম ও প্রত্যেক শ্রমিক যাতে দৈনিক অন্তত পুরো এক হাজিরা রোজগার করতে পারে তার জন্য সর্দারের উপর চাপ দিলাম। সঙ্গে সঙ্গে শ্রমিকদের মধ্যে প্রতিযোগিতার সৃষ্টি হ'ল উপঢৌকন প্রথা প্রবর্তন করায়। স্ত্রী শ্রমিকদের

মধ্যে পাতি তোলার কাজে এই প্রথা সবচেয়ে কার্যকরী হল। প্রত্যেক মাসের শেষে হিসেব করা হত তোলা পাতার পরিমাণ কার বেশী হয়েছে। প্রথম তিন জনকে এক এক মাসে এক এক রকম প্রয়োজনীয় জিনিস উপহার দেওয়া হত। এর ফল খুবই ভাল হল। উৎপাদন পূর্ব বৎসরের প্রায় দ্বিগুণ হল এবং শ্রমিকদের মনেও একটা সন্তুষ্টির ভাব দেখা দিল। কিন্তু প্রতিবেশী দেশী বাগানগুলির সমূহের কর্তৃপক্ষেরা আমার এ-কাজকে সুনজরে দেখল না। তাঁদের ভয় হল তাঁদের বাগানের শ্রমিকদের ওপরও এর প্রতিক্রিয়া দেখা দিতে বিলম্ব হবে না। তাঁরা আমার প্রতি অনেকটা বিরুদ্ধ ভাবাপন্ন হয়ে পড়লেন। কিন্তু ক্রমে যখন এর সুফল আমার বাগানে লক্ষ্য করলেন, তখন তাঁরাও এই প্রথা চালু করলেন। আর একটা লাভ এই হল যে, যখন এই সব খবর সালঙ্কারে ইউরোপীয় বাগানে পৌঁছল তখন ঐ সব বাগানের কতক কতক শ্রমিক ওখানকার পাট উঠিয়ে আমার বাগানে আসতে লাগল। এতে ইউরোপীয় পরিচালকদের সঙ্গে আমার বিরোধ বাধল। তারা দাবী করলেন হয় শ্রমিকদের ফিরিয়ে দিতে, নয় তাদের নামে বাগানের খাতায় যা হাওলাত ধরা আছে তা মিটিয়ে দিতে। কিন্তু 'আড়কাটি' প্রথায় সংগৃহীত শ্রমিকদের হাওলাতের প্রকৃতি আমার জানা ছিল বলে আমি কোন প্রস্তাবেই রাজী হইনি। এ নিয়ে তাদের আইন আদালত করারও কোন উপায় ছিল না কারণ তাহলে ভেতরের গলদ সব প্রকাশ হয়ে হিতে বিপরীত হত।

তারা বাধ্য হল শ্রমিকদের মজুরীর হার বাড়াতে।

এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে যে, ১৯২২ সালের শ্রমিক অভিযানের পর থেকেই পূর্ববর্ণিত 'গিরিমিট' প্রথার আমূল পরিবর্ত্তন হয়েছে। শ্রমিকের মনে জেগেছে আত্মমর্যাদা ও ও ব্যক্তি স্বাধীনতা। গগনবিদারী চিৎকারে যা সম্ভবপর হয় নি আন্তরিকতা ও হৃদয়ের দৃঢ়তায় তাকে সহজসাধ্য করে আনা হল।

আর একটা সংস্কারের এখানে ভবিষ্যৎ ফল সুদূরপ্রসারী হয়েছিল। কোম্পানীর নামে প্রায় বার্ষিক ১০,০০০ টাকা আয়ের একটি পত্তনি ছিল। একজন ভারপ্রাপ্ত নায়েব এর খবরদারি করতেন। এমন সুযোগ থাকতেও এর থেকে বাগানের শ্রমিকদের কোন উপকারই হত না। নায়েব মশায় জমি-জমা সবই বাইরের লোককে বন্দোবস্ত দিতেন। কোম্পানীতে লিখে এই পত্তনিটিকে বাগানের নিয়ন্ত্রণাধীন করার ফলে নিলাম ও নায়েব মশায়ের উপর কর্তৃপক্ষ থেকে নির্দেশ জারি হ'ল নতুন বিলি ব্যবস্থা সব বাগানের পরিচালকের সঙ্গে পরামর্শক্রমে করতে হবে। এই নির্দেশ অনুসারে ১০০ বিঘা আবাদযোগ্য পতিতজমি বাগানের শ্রমিকদের জন্য সংরক্ষিত করে রাখা হল। এই জমি পরে পরিবারের আয় অনুসারে শ্রমিকদের মধ্যে বণ্টন করা হয়েছিল। শ্রমিকের বর্ধিত হার ও এই জমি হতে প্রাপ্ত ফসল একযোগে তাদের স্বচ্ছলতা এনে দিয়েছিল ও বাগানের কাজে তাদের উৎসাহিত বর্দ্ধন করেছিল! নিয়ম করা হয়েছিল বাৎসরিক মেয়াদে জমির স্বত্বদখল ধার্য হবে সংশ্লিষ্ট পরিবারের বাগানে কাজ করার গুণাগুণের অনুপাতে।

চা-বাগানের পরিচালককে একাধারে শ্রমিকের প্রভু, পিতা, উপদেষ্টা, এমন কি মধ্যে মধ্যে চিকিৎসকের ভূমিকাও গ্রহণ করতে হয়। এই শেষোক্ত ভূমিকায়, অবস্থার বিপাকে আমাকে এক কৌতুককর ঘটনার নায়ক হতে হয়েছিল। এর আরম্ভ করুণ রসে ও পরিসমাপ্তি হাস্য রসে ৷ বিষয়টি স্মরণ করে যদিও আমি কৌতুক বোধ করছি, তবুও নাটকটির পটভূমিকা আমাকে সে সময় অভিভূত ও আতঙ্কগ্রস্ত করে তুলেছিল। অধিকাংশ চা-বাগান থেকেই ডাকঘর দু তিন মাইল দূর। ডাক আনা-নেওয়ার জন্য তাই প্রত্যেক বাগানে এক একজন ডাকওয়ালা থাকে। এ বাগানেও একটি বুড়ো ডাকওয়ালা ছিল। তার একমাত্র ছেলে দীর্ঘকাল ধরে রোগে ভুগছিল। বাগানের ডাক্তারের চিকিৎসার দোষেই হোক, অথবা সংস্কারগ্রস্ত রোগীর নিজের ত্রুটিতেই হোক রোগটি নির্মুল হওয়ার কোন লক্ষণই দেখা যাচ্ছিল না। ডাকওয়ালা আমাকে ধরে বসল, যদি আমি কোন ওষুধ দিই তাহলে তার ছেলের রোগ সেরে যাবে। সাধারণত শ্রমিকদের ধারণা ম্যানেজারদের গোপন ভাণ্ডারে তাদের নিজেদের ও অন্যান্য কর্ম্মচারীদের চিকিৎসার জন্য ভাল ওষুধ মজুত থাকে। আমি ডাকওয়ালার হাতে একটি ‘পাইরেক্সের’ শিশি দিয়ে দিনে তিন দাগের বেশী খাওয়াতে বারণ করে দিলাম, কারণ অধিক মাত্রায় খাওয়ালে পেটের গোলমাল হয়ে বিপদ হতে পারে। এই সব অশিক্ষিত শ্রমিকদের ধারণা ওষুধ একসঙ্গে যত বেশী খাওয়াবে তত তাড়াতাড়ি ফল হবে। পরের দিন ভোরে আমি আমার বাংলোর সামনের বারান্দায়

আরাম কেদারায় বসে আছি এমন সময় একটি বিলাপধ্বনি আমার কানে এল। আমার বাংলো যে টিলায় অবস্থিত ছিল সেখান থেকে একটি রাস্তা নেমে ঠিক বাংলোর নীচে দিয়ে সোজা অগ্রসর হয়ে প্রায় দুই ফার্লং দূরে আর একটি টিলার সঙ্গে মিশে দুইভাগে বিভক্ত হয়ে দুটি শাখা টিলাকে প্রদক্ষিণ করে সদর রাস্তায় মিলেছিল। এই দ্বিতীয় টিলাতে শ্রমিকদের লাইন বা ব্যারাক। ব্যারাকের একটি ঘরে ডাকওয়ালা থাকত। আমি যে বারন্দায় বসেছিলাম সেখান থেকে দুই টিলার মাঝখানের সমস্ত রাস্তাটাই স্পষ্ট দেখা যেত! চিৎকারটা ডাকওয়ালার আর্তনাদ, শুনতে পেলাম "এ হামারা ক্যায়া হো গিয়া ভগবান। মেরা সব লে লিয়া। হামারা সর্ব্বনাশ হো গিয়া! হে রাম, এ কেয়া কর দিয়া।" শুনেই কেমন সন্দেহ হল, প্রশ্ন করলাম, সব ওষুধটা কি একসঙ্গে খাইয়ে দিয়েছিস? উত্তর না দিয়ে ডাকওয়ালা কাছে এসে আকুল হয়ে লুটিয়ে পড়ল পায়ে। আমি স্তব্ধ, হতবাক, বিমূঢ়।

কিছুটা প্রকৃতিস্থ হয়ে হুঙ্কার ছাড়লাম, 'জলদি বল, কি হয়েচে।

বিলাপ মিশ্রিত সুরে সে বলল, হামরা বিলকুল কাল রাতমে চোরায়কে লে গিয়া, ইস্কো বিচার কিজিয়ে, হুজুর।"

হাসব কি কাঁদব? ভগবানের কাছে প্রার্থনা করলাম জীবনে আমাকে যেন আর কারো চিকিৎসা করতে না হয়।

চিকিৎসা প্রসঙ্গে শ্রমিকদের কুসংস্কারের আর একটা কথা মনে পড়ল। একবার বাগানে ব্যাপকভাবে মহামারীর আবির্ভাব হয়। কয়েকটি শ্রমিক মারাও যায়। প্রতিষেধক

inoculation-এর ব্যবস্থা করা হয়, কিন্তু এক সম্প্রদায় শ্রমিকের ধারণা 'সুই' (injection) এর অবশ্যম্ভাবী ফল মৃত্যু। তাই তারা সুই নিতে নারাজ। তবু জোর করে প্রতিষেধক দেওয়া হল। পরের দিন দেখা গেল ঐ সম্প্রদায়ের সমস্ত শ্রমিক—পনরটি পরিবার বাগান থেকে অদ্ধর্ান করেছে!

শুধু চিকিৎসা কেন, বিদ্যাশিক্ষা বিষয়েও কোন কোন শ্রমিক সম্প্রদায়ের মধ্যে কুসংস্কার দেখেছি। এই বাগানেরই ভূতপূর্ব কোন সর্দারের ছেলে এক ইউরোপীয় ম্যানেজারের সাহায্যে কাছাকাছি শহরে থেকে উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়ের অষ্টম শ্রেণী অবধি পড়ে! তার বাবা ছিল সাহেবটির খুব প্রিয়। বাগানটী দেশী কোম্পানীর কাছে বিক্রী হয়ে যাওয়ার পর সাহেবের সঙ্গে তার বাবা সপরিবারে অন্য বাগানে চলে যায়। বাপের মৃত্যুর পর ছেলে সর্দার নিযুক্ত হয়। সেখানেই বিবাহ করে। তার তিনটি পুত্র-সন্তান জন্মায় সর্বশেষ সন্তান প্রসবের অব্যবহিত পরেই তার স্ত্রীর মৃত্যু হয়। তার জ্ঞাতি গোষ্ঠী ঐ বাগানে কেউ না থাকায় সে অসহায় ভাবে এখানে এসে আশ্রয় নেয়।

শিক্ষিত যুবক দেখে একটি প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপন করে আমি তাকে শিক্ষক নিযুক্ত করি ও ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের স্কুলে ভর্তি করার জন্য শ্রমিকদের যত্ন নিতে বলি। এই প্রচেষ্টায় সে সর্বাপেক্ষা বেশী বাধা পেল নিজের সম্প্রদায় থেকে।

তারা বলল, তাদের সম্প্রদায়ের যেই নাকি বেশী লেখাপড়া শিখেছে, তারই সর্বনাশ হয়েছে।

বলল, "হুজুর, দেখবেন ওরও অব্যাহতি নেই"।

এক বৎসর পরিশ্রমের পর মোটামুটি একটি স্কুল গড়ে উঠল। এর কিছুদিন পরই যুবকটির সব চেয়ে ছোট ছেলেটি মারা গেল। জ্ঞাতি গোষ্ঠীরা ভয় দেখাতে লাগল, তার সর্বনাশের দিন এসে গেছে। পর পর স্ত্রী ও সন্তানের মৃত্যুর পর যুবকটির মনেও বোধহয় সংস্কারের স্পর্শ লাগল। সেও যেন ভয়ে ম্রিয়মান হয়ে রইল! এমন অবস্থায় আমি একদিন তাকে নিজের সম্প্রদায় থেকে একটি যুবতী মেয়ে দেখে আবার বিয়ে করার উপদেশ দিলাম। যুবকটির নম্র ও ভদ্র ব্যবহারে তার প্রতি আমার একটু দুর্বলতা জন্মে যায়। কিন্তু কেউ তাকে মেয়ে দিতে রাজী হল না। তারা বলতে লাগল, যার সর্বনাশ সুনিশ্চিত তার হাতে মেয়ে সমর্পণ করবে কোন সাহসে? এতে যুবকের মন আরও ভেঙে পড়ল। তার সঙ্গে আলোচনায় বুঝলাম যে পুরুষানুক্রমিক কুসংস্কার তাকেও আচ্ছন্ন করতে আরম্ভ করেছে। ওদিকে জ্ঞাতি গোষ্ঠিও তাকে এড়িয়ে চলতে লাগল। এ সমস্ত মিলে তার মনে চলল সংশয় ও ভয়। একদিন সকালে বাগানের জনৈক চৌকীদার খবর নিয়ে এল লোকটির ঘরের দরজা অধিক বেলা অবধি বন্ধ দেখে তারা দরজা ভেঙ্গে ঘরের ভিতর ঢুকে দেখে এক বীভৎস দৃশ্য। শিক্ষকের মৃতদেহ শূন্যে ঝুলছে ঘরের চাল থেকে। আর সন্তানদের মৃতদেহের পাশে এক রক্তাক্ত কুঠার পড়ে আছে। খবরটি শুনে স্তম্ভিত হয়ে গেলাম।

ইংরেজদের একটা গুণ, তারা যেখানেই যে অবস্থায় থাকুক না কেন, নিজেদের একটা সামাজিক পরিবেশ সৃষ্টি করে নিতে

পারে। এমন কি তুজন ইংরেজও যদি এক অঞ্চলে বাস করে পরস্পরের সঙ্গে সংযোগ রাখার জন্য একটা মিলনক্ষেত্র ঠিক করে নেয়। শ্রীহট্ট কাছাড়ে ইংরেজ চা-করদের মন আঞ্চলিক অনেকগুলি ছোট ছোট "ক্লাব" ছিল ও শিলচরে ছিল একটি বড়ো কেন্দ্র। মামাবাবুর চা-বাগানের উপর তার নিজস্ব জমিতে এ ধরণের একটি ইউরোপীয় ক্লাব এখনও বর্ত্তমান। এই ক্লাবে একমাত্র দেশীয় সভ্য ছিলেন মামাবাবু। নিয়মিতভাবে সপ্তাহে একদিন সভ্যেরা মিলিত হয়ে পোলো, তাস ইত্যাদি খেলায় যোগ দিত। এটা বলতে গেলে একটা "ফাঁড়ি" ক্লাব ছিল। এর মাইল দশেক দূরে বড় ক্লাব। সেখানে মাসে একবার সমস্ত "ফাঁড়ি" ক্লাবের সভ্যেরা আসত। চলত টেনিস খেলা, হৈ-হুল্লোড়। সাহেব-মেমেরা নাচত। এই আঞ্চলিক ক্লাবের ইউরোপীয়দের নিত্যপ্রয়োজনীয় সমস্ত জিনিশ সভ্যদের কাছে বিক্রীর জন্য মজুত থাকত। প্রতি মাসের প্রথমভাগে ক্লাবের সমস্ত প্রাপ্য সভ্যদের মিটিয়ে দেওয়াই ছিল নিয়ম। সকল সভ্যই এ নিয়ম মেনে চলত। কারণ এর ব্যতিক্রম হলেই ক্লাব থেকে দূরে সরে এসে, নিজের সমাজে অবহেলিত হওয়া। এ ছাড়াও ইংরেজদের নিয়ম-নিষ্ঠার দিকে একটা স্বাভাবিক আকর্ষণ আছে। অদৃষ্টের ফেরে কিংবা অবস্থার আকস্মিক বৈগুণ্যে যদি কোন সদস্যের কাছ থেকে প্রাপ্য আদায়ের অন্য কোন পথ না থাকত, তা হলে চাঁদা তুলে অন্যান্য সদস্যরা তা পুরণ করে দিত। ভারতের অবাঙালী সমাজেও এই রীতির অস্তিত্ব দেখা যায়। কিন্তু বাঙালী সমাজে এমন অবস্থায় জোটে লাঞ্ছনা, গঞ্জনা ও অবমাননা।

তখনকার দিনে এ অঞ্চলে সম্ভ্রান্ত হিন্দু মহিলাদের অবাধ মেলামেশার গণ্ডী আপন স্বজনদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। তাই আমার মামীমা এইসব ক্লাবেও যাতায়াত করতেন। তিনি ইংরেজী ভাষা জানতেন না, কিন্তু সাহেব-মেমদের সঙ্গে হিন্দীতে স্বচ্ছন্দে কথাবার্ত্তা চালিয়ে যেতেন। সাহেব-বিবিরাও মামাবাবুর বাংলোতে প্রায়ই দেখা করতে আসতেন। এই মেলামেশার জন্য মামাবাবু ও মামীমার বিরুদ্ধে অনেক অপ্রিয় সমালোচনা তখন শুনেছি। কিন্তু অপরপক্ষে ইউরোপীয়দের সঙ্গে আলাপে অনুভব করেছি এর ফলে ভারতীয় নারীদের প্রতি তাদের অনেক ভ্রান্ত ধারণার অপনোদন হয়েছে এবং ভারতীয় নারী-সমাজের প্রতি একটা মর্যাদাজ্ঞান জন্মেছে। সাধারণত শ্রমিক মেয়েদের অসংযত আচরণের ছবিই সাহেবরা দেখত; ভারতীয় নারীত্বের এই নতুন রূপ তাদের মনোভাব অনেক পরিমাণে বদলে দিয়েছিল।

আমি আমার বর্তমান কর্মক্ষেত্রের কাছাকাছি একটি বাগানে তার ইউরোপীয় পরিচালকের সঙ্গে একবার দেখা করতে যাই। ১৯২৫ সালের কথা বলছি। সেখানে তাঁর বাগানের অবস্থা দেখবার জন্য তিনি আমাকে সঙ্গে করে বেরুলেন। ঘুরতে ঘুরতে আমরা সেখানকার সহকারী পরিচালক একটি ইংরেজ যুবকের মুখোমুখি হই। ।আমার পরিচালকবন্ধু তাঁর সহকারীর সঙ্গে প্রশ্নাদি বিনিময়ের পর হঠাৎ রাগতভাবে তাকে 'হারামজাদা, কুত্তিকাবাচ্চা" বলে কটুক্তি করতে লাগলেন। সহকারীটি নিশ্চল, নীরব।

প্রত্যাগমনের পথে আমি তাঁকে বললাম, 'আমাদের দেশের কোন সহকারীর সঙ্গে এরকম ব্যবহার করলে সে হয়ত আমার গালে চাঁটি কষিয়ে চাকরী ছেড়ে চলে যেত।" শুনে সাহেব সহাস্যে আমাকে বললেন, "ও মোটে হালে বিলেত থেকে এসেছে। গালাগালের ভাষা যদি আয়ত্ত না করতে পারে তবে শ্রমিক চালাবে কি করে ? তোমাদেরই একজন স্বদেশবাসীর কাছে শুনেছি মধ্যপ্রদেশ অঞ্চলে পথে কোন অপরিচিত লোককে মধুর ভাষায় কোন প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করলে সে ঔদাসীন্য দেখিয়ে চলে যায়, কিন্তু তাকেই যদি গালাগাল দিয়ে প্রশ্ন করা যায়, তবে সে সসম্ভ্রমে জবাব দেওয়ার পথ পায় না।" বলে তিনি উচ্চহাস্যে আমাকে সচকিত করে তুললেন।

আমার বাগানটি ছিল জুরি ও লঙ্গাই উপত্যকার সংযোগস্থলে। এ অঞ্চলে অনেকগুলি দেশী চা-বাগান ছিল। সমস্ত দেশী পরিচালক ও অন্যান্য কর্মচারী মিলে এ অঞ্চলে অনেক চেষ্টার পর ইউরোপীয় ক্লাবের অনুকরণে একটি দেশী ক্লাব প্রতিষ্ঠিত হয় ; কিন্তু পরস্পরের প্রতি বিদ্বেষ, স্বার্থের বিরোধ ও ক্ষমতার প্রলোভন ক্লাবটিকে প্রায় দু বছর পর অচল অবস্থায় নিয়ে আসে। বাঙালী চরিত্রের এই দুর্বলতা বাঙালীকে পঙ্গু করে রেখেছে। ইউরোপীয় ক্লাবে এইসব হীন মনোভাবের প্রভাব লক্ষ্য করিনি। তাদের দেখেছি, বৃহত্তর স্বার্থের খাতিরে ক্ষুদ্র স্বার্থ বিসর্জন দিতে ; কিন্তু আমাদের বাঙালী সমাজে দেখি বৃহত্তর স্বার্থকে ক্ষুদ্র স্বার্থের কুক্ষিগত করার প্রচেষ্টা।

১৯২৬ সালে আমাকে এই কোম্পানীরই আর একটি

বাগানে যেতে হল, এই বাগান থেকে চার মাইল দূরে। ব্যয়-সঙ্কোচের জন্য দুটি বাগানের চা-ঘরকে একত্র করে যন্ত্রপাতি নতুন বাগানটিতে, নিয়ে আসা হল। দুটি বাগানকে সংযুক্ত করে তৈরী কর হল একটা নতুন ভাল রাস্তা। লরীযোগে তখন এক বাগান থেকে অন্য বাগানে চা-এর পাতা পাঠানো হত। দুটি বাগানই তখন আমার কর্তৃত্বাধীনে এসে পড়ায় আমার কাজ যদিও বাড়ল, আমি দুই বাগানের শ্রমিককে এক নিয়মে এনে পরস্পরের মধ্যে একটা যোগসূত্র তৈরী করার সুযোগ পেলাম। উদ্দেশ্য সিদ্ধির সঙ্কল্পে আমার প্রথম কাজ হল দুই বাগানের শ্রমিকদের জন্য একটি 'দুঃস্থ ভাণ্ডার" স্থাপন করা। ত্রই ভাণ্ডারের পরিচালনার ভার দেওয়া হল শ্রমিক ও কর্ম্মচারীদের মনোনীত প্রতিনিধি নিয়ে গঠিত একটি কার্যনির্বাহক সমিতির উপর। প্রত্যেক শ্রমিকের আয় থেকে টাকায় এক পয়সা করে ও কোম্পানী থেকে ঠিক সমপরিমাণ দান ভাণ্ডারে জমা করা হ'ত। বণ্টনের ব্যাপারে সমিতির সদস্যদের মধ্যে প্রথম প্রথম সম্প্রদায়গত পক্ষপাতিত্ব দেখা যেতে লাগল; কিন্তু ক্রমে ভাণ্ডারের মুলগত নীতি হৃদয়ঙ্গম করার সঙ্গে দেখা দিতে লাগল উদারতা। ভাণ্ডারটি স্থাপনের উদ্দেশ্য ছিল শ্রমিকদের পরস্পরের প্রতি সহানুভূতির ক্ষেত্র প্রস্তুত ও সম্প্রদায়গত বা শ্রেণীগত সঙ্কীর্ণতার নিরোধ। এছাড়া শ্রমিকদের দায়িত্বের মধ্যে টেনে এনে তাদের আত্মমর্যাদার জ্ঞান বাড়িয়ে দেওয়াও এর অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল।

কিছুদিন পর এখানকার এক-সম্প্রদায় শ্রমিকের সঙ্গে

সামান্য কারণে আমার একটু বিরোধ সৃষ্টি হল। ঐ সম্প্রদায়ের একটি মেয়ের বিয়ে হয় অন্য বাগানের এক যুবকের সঙ্গে মেয়ের বাপ অত্যন্ত অর্থলোভী। সে এক দিন মেয়েটিকে শ্বশুরবাড়ীর থেকে নিয়ে আসে ও গোপনে গোপনে তার পূর্ব স্বামীর সঙ্গে সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন করে আমারই বাগানের এক যুবকের সঙ্গে পুনর্বিবাহ দেওয়ার বন্দোবস্ত করে। স্বামীটি স্ত্রীকে নিতে এসে অপমানিত হয়ে ফিরে যায়। তখন সে বাগানের ইউরোপীয় পরিচালক সমস্ত তথ্য জানিয়ে মেয়েটি যাতে তার স্বামীর কাছে ফিরে আসে তার ব্যবস্থা করে দিতে আমাকে অনুরোধ জানিয়ে চিঠি লেখেন। আমি শ্রমিককে ডাকিয়ে এনে তার এই আচরণের কারণ জিজ্ঞাসা করলাম। শ্রমিকটি নির্বিকারে বলে বসল, "হুজুর মেয়েটিকে এখানে রাখলে তো আপনারই লাভ। একটি কাজের লোক বাড়বে। আর হুজুর! ও বেটা ত (জামাই) নপুংসক।"

তার যুক্তির ঔদ্ধত্য আমাকে রাগে আগুন করে তুলল। স্বামীটিকে আমার কাছে পাঠিয়ে দেবার জন্যে আমি তার মনিবকে চিঠি লিখে দিলাম। লোকটি এলে আমি তার শ্বশুরের উপস্থিতিতে তাকে পরীক্ষা করার জন্য ডাক্তারকে ডাকলাম। ডাক্তারী পরীক্ষায় স্বামীর পূর্ণাঙ্গতা সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ হয়ে আমি শ্বশুরকে বলে দিলাম, স্বামীর সঙ্গে মেয়েটিকে তার স্বস্থানে পাঠিয়ে দিতে। শ্রমিকটি তখন নীরবে চলে গেল। কিন্তু আমার আজ্ঞা পালন না করে আত্মীয়স্বজনের সঙ্গে পরামর্শের পর সে আমাকে জানিয়ে দিল, ও সপরিবারে বাগান ত্যাগ করতে প্রস্তুত, তবুও মেয়েকে ছাড়বে না। আমি আদেশ

দিলাম বাগানের সমস্ত প্রাপ্য না মেটান পর্যন্ত শ্রমিকটির সঞ্চিত ধান ও গরু যেন আটক করে রাখা হয়। কিন্তু শ্রমিকের নিজের বা পরিবারের অন্যান্য লোকেদের যাওয়ার পথে যেন কোন বাধা না দেয়া হয় আমার আদেশে সে কথাও ছিল। খানিক পর সেই সম্প্রদায়ের সমস্ত লোক একযোগে এসে জানাল তারা সকলেই শ্রমিকটির অনুগামী হতে চায়। আমি তাদের প্রতিও ঐ আদেশ দিয়ে উপযুক্ত পাহারার বন্দোবস্ত করে দিলাম। এই শ্রমিক সম্প্রদায় ছিল বাগানের বহু পুরাতন অধিবাসী ও তারা শ্রমিক হিসাবেও বেশ সম্পন্ন। আমার মনোভাব দেখেও বোধ হয় শেষ পর্য্যন্ত সম্পত্তির মায়াজালে তারা সঙ্কল্পচ্যুত হ'ল ও কন্যাটিকে তার স্বামীর হাতে সমর্পণ করতে সম্মত হল। তাদের শুধু একটি সর্ত্ত, স্বামীটিকে একটি জ্ঞাতি-ভোজ দিতে হবে। মনে হয়, প্রেষ্টিজ রক্ষা হিসেবে এই দাবী।

ঠিক এই সময়ে সংবাদ পেলাম শ্রমিকদের সঙ্গে সঙ্ঘর্ষে কাছাড়ের একটি ইউরোপীয় বাগানে মেয়ে শ্রমিকরা সেই বাগানের ইউরোপীয় ম্যানেজারকে উত্তম-মধ্যম প্রয়োগে শয্যাশায়ী করেছে ও জেলার শাসনকর্তার দাঁত ভেঙ্গে দিয়েছে। একটি শ্রমিকের ত্রুটির জন্য ম্যানেজারটি তাকে প্রহার করেন। শ্রমিকেরা সঙ্ঘবদ্ধভাবে এর প্রতিবাদস্বরূপ ধর্মঘট করে। ক্রোধান্ধ হয়ে সাহেব তাদের জোর করে কাজে বের করার চেষ্টা করেন। ফলে সঙ্ঘর্ষ বাধে। সদরে টেলিগ্রাম গেলে জেলার কর্ত্তা, অপর একটি ঝানু ইংরেজ, সশস্ত্র সৈন্যসহ বাগানে আসেন। শ্রমিকরা কিন্তু এতে বিচলিত হয়নি। তিনি

শ্রমিকদের সারিবদ্ধভাবে দাঁড় করিয়ে ভীতি উৎপাদনের জন্য আস্ফালন করতে থাকেন ও একটি স্থূলকায়া রমণীকে দেখিয়ে তাকে সারি থেকে টেনে বের করার জন্য জনৈক সৈনিককে আদেশ দেন। তখন উপস্থিত সব মেয়ে শ্রমিকরা ইট, কাঠ নিয়ে তাকে আক্রমণ করে। প্রহারের ফলে জেলাধিপতি একটি দাঁত রমণীদের উপহার দিয়ে আসেন ও দুটি অর্ধদন্ত নিয়ে রমণীর কমনীয় হস্তের ধ্যানে নিমগ্ন হয়ে ম্যানেজারের বাঙলায় ফিরে আসেন। অতর্কিত আক্রমণে বিভ্রান্ত হয়ে সাহেব বন্দুক চালনার হুকুমদানে বঞ্চিত হন। এরপর দিনকয়েক সৈন্যদের অত্যাচারে স্বাভাবিক অবস্থা আসে। কিন্তু এ সংবাদ ইউরোপীয় মহলে আতঙ্কের সৃষ্টি করে। শ্রমিকদের প্রতি সাহেব-প্রভুদের ব্যবহারেরও একটা মাত্রা-নির্ধারণ হয়ে যায়। ১৯২২ সালে শ্রমিক অভিযানের পর এই ঘটনা চা-বাগান পরিচালকদের জ্ঞানোদয়ের একটি কারণ বলা যেতে পারে। চা-বাগানের ব্যাপক শ্রমিক জাগরণের সূত্রপাত এইখানেই ধরে নেওয়া যায়। সমষ্টিগত স্বার্থবোধের উৎপত্তিও এইস্থানেই।

আমার জীবনের আর এক ঘটনা এইখানেই ঘটেছিল। এ অঞ্চলের স্থানীয় অধিবাসীরা ছিল খুব সাহসী ও বলবান। এদের দুর্ধর্ষ লাঠিয়াল হিসেবে খ্যাতি আছে। জালের ভিতর আটকে বাঘ-মারা এদের অতিপ্রিয় আমোদ। যেখানেই হোক জঙ্গলে কোন বাঘের অস্তিত্ব প্রমাণিত হ'লে, এদের ডাক পড়ত।

"জাল দিয়ে বাঘ-ধরা" এ কথা শুনলে, যাঁরা এ ব্যাপারের প্রত্যক্ষ দর্শক নন, তাঁদের কাছে এটা নিতান্ত অদ্ভুত

কাণ্ড বলে মনে হবে। এই শিকারে যারা লিপ্ত থাকে, তাদের সাহস অমিত, তারা জীবনমরণের সঙ্গে লুকোচুরি খেলা খেলে। এদের একনিষ্ঠা ও শিকারীর সহজাত ক্রূরতা প্রত্যক্ষদর্শীকে রোমাঞ্চিত ও বিমুগ্ধ করে। খোলা মাঠের কাছে কোন জঙ্গলে বাঘের আবির্ভাব প্রতিপন্ন হলে এরা খুব মোটা মজবুত দড়ির প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড কয়েকটি জাল নিয়ে ঘটনাস্থলে উপস্থিত হয়। প্রথমেই বাঘের আশ্রয়স্থল নির্ণয় করে জাল-পাতার উপযুক্ত স্থান নির্ধারণ করে। জঙ্গলের সামনের মাঠে প্রায় আধ মাইল বিস্তৃত সমতলভূমির উপর বাঁশ অথবা কাঠের খুটির সাহায্যে লম্বালম্বিভাবে জালগুলি একটির পর একটি সংযুক্ত করে গোলাকারে সাজান হয়। মূল ব্যূহ থেকে সরু রাস্তার মত সামন্তরালভাবে জালঘেরা একটি স্বল্পপরিসর প্রবেশ-পথ জঙ্গলের ভিতর কিছুদূর পর্যন্ত টেনে নিয়ে যাওয়া হয়। তারপর ব্যূহের চারিদিকে বর্শা, বল্লম, বন্দুক নিয়ে শিকারীরা দাঁড়িয়ে যায়। প্রবেশ পথে খুব সাহসী ও বলবান লোকের প্রয়োজন, কারণ তাদের উপরই শিকারের সমস্ত সাফল্য নির্ভর করে। প্রবেশের মুখে যারা থাকে, তাদের উপরই বাঘের প্রথম আক্রমণ চলে। সুতরাং তারা হবে নির্ভীক, দুঃসাহসী মরণে উদাসীন। এই প্রবেশ মুখের নাম চলতি-ভাষায় "যমের দুয়ার"। এখানে যে চারজন রক্ষী বল্লম, বর্শা, খাঁড়া নিয়ে দাঁড়ায়, তাদের, যে কোন মুহূর্তে অতর্কিত আক্রমণের আশঙ্কায়, তৈরী থাকতে হয়। বন্দুক ব্যবহার এখানে নিষিদ্ধ, কারণ বাঘকে অক্ষতদেহে ব্যূহের ভিতর ঢুকতে দেয়াই নিয়ম। এমন একটি অভিযানে যাওয়ার জন্য আমন্ত্রণ এল আমার।

আমিও সাদরে নিমন্ত্রন গ্রহণ করলাম, কারণ এই শিকার প্রত্যক্ষ করার প্রবল বাসনা আমার অনেকদিন থেকেই ছিল।

শুনলাম, আমারই বাগান থেকে সাত-আট মাইল দূরে একটি ছোট জঙ্গলাকীর্ণ টিলায় একটি প্রকাণ্ড "রয়েল বেঙ্গলকে" প্রবেশ করতে দেখা গেছে ও তার জন্য জাল-পাতা হয়েছে। এই টিলাটি ছিল একজন সম্ভ্রান্ত মুসলমান জমিদারের এলাকায়। তিনিই আমাকে আমন্ত্রণ জানালেন আমার বন্দুকটি সঙ্গে করে নিয়ে যাওয়ার জন্য।

ঘটনাস্থলে গিয়ে দেখি যথাবিধি ব্যূহ রচনা হয়ে গেছে। জঙ্গলের ভিতর থেকে ঢাক, ঢোল, কেনেস্তারা, কাঁসা, শিকারীদের বিকট হুঙ্কার—সব মিলে একটি গোলমাল ভেসে আসছে। অর্থাৎ জঙ্গলের আশ্রয়স্থল থেকে বাঘকে তাড়িয়ে ব্যূহের দিকে আনা হচ্ছে। আশ্রয়স্থল কেন্দ্র করে ব্যূহের দিকে গতিপথ উন্মুক্ত রেখে একটি প্রকাণ্ড বাহিনী বৃত্তকে সঙ্কীর্ণতর করতে এগিয়ে এল। দেখলাম, সামনের প্রান্তরে, ব্যূহের বাইরে যেন জনাকীর্ণ একটা মেলা বসে গেছে। অস্থায়ী পান, সিগারেট, চা মিষ্টান্নের সারি সারি দোকান। যেন সংগ্রামের জন্য সৈন্য সমাবেশ হচ্ছে। অগণিত জনস্রোত গভীর উত্তেজনায় প্রান্তরের দিকে ছুটে আসছে তামাশা দেখার জন্য। একটা কল-কোলাহলে প্রান্তর মুখরিত। কিন্তু বাঘ যতক্ষণ না ক্ষুধার্ত হচ্ছে ততক্ষণ তাকে আশ্রয়চ্যুত করা অসম্ভব। এ অবস্থায় দু-তিন দিন অতিবাহিত হওয়াও নাকি আশ্চর্য নয়। শিকারী, দর্শক সকলকেই সচকিত হয়ে আপন আপন নির্দিষ্ট স্থানে নিশ্চল হয়ে অপেক্ষা করতে হয়। তাই কয়েক

ঘণ্টা অন্তর অন্তর বিশ্রামের জন্য শিকারীদের স্থান বিনিময় চলল। দর্শকেরা গাছপালা কেটে জঙ্গল পরিষ্কার করে আশ্রয়স্থল তৈরী করে নিল। জমিদার-বন্ধু বিশিষ্ট অতিথিদের জন্য শিবির ও আহারের ব্যবস্থা করছিলেন। রাত্রের জন্য চারদিকে "পেট্রোম্যাক্স" লাইটের উজ্জ্বল আলোর বন্দোবস্তও ছিল। সব মিলে যেন যুদ্ধক্ষেত্রের প্রান্তসীমায় একটি সৈন্য-শিবির।

দুদিন কাটার পর হঠাৎ বাঘের গর্জনে সকলেই কেঁপে উঠল। "বাঘ আসছে," "বাঘ আসছে," বলে চিৎকার করে স্ব স্ব স্থানে সকলেই আকুল প্রতীক্ষায় আশা-আশঙ্কার ভিতর দিয়ে সতর্ক হয়ে উঠল। গর্জন করে উঠে বাঘ প্রবেশমুখের মোটা দড়িতে লাফিয়ে পড়ল। রক্ষীদের বর্শার আঘাতে বাধা পেয়ে সে জঙ্গলের দিকে ফিরে যাবার চেষ্টা করল কয়েকবার। কিন্তু অনুসরণকারীদের উদ্যত বর্শা ও কোলাহলে কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে সক্রোধ-আস্ফালনে বার বার জালে আঘাত করতে লাগল। অবশেষে শ্রান্ত ও ক্লান্ত হয়ে সবুজ পাতায় ঢাকা প্রবেশ পথে তাকে ব্যূহে ঢুকতে হল।

ব্যূহের ভিতর বাঘকে দিন সাতেক বন্দী করে রাখা হয়, দূর দূরান্তের দর্শকদের দেখার সুযোগ দেওয়ার উদ্দেশ্যে। এই সময় বাঘকে খেলান হয়। বাঘ যখনই জালের দড়িতে লাফিয়ে পড়তে চায় তখনই অসংখ্য উদ্যত বর্শা, বল্লমের আঘাতে তাকে মাঝখানে ফিরে যেতে হয়।

এক্ষেত্রে সাতদিনের পর বাঘ অবসন্ন হয়ে পড়লে জমিদার সাহেব আমাকে অনুরোধ করলেন ব্যূহের ভিতর বাঘকে গুলি করতে। সাধারণ নিয়মে ঘটনাস্থলের ভূম্যাধিকারীরা

এই সম্মানের অধিকারী। কিন্তু বন্ধুতাবশত তিনি এ সম্মান আমাকে ছেড়ে দিলেন। ব্যূহের চারদিকে তখন শিকারীরা অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে দাঁড়িয়ে। এ অবস্থায় লক্ষ্যভ্রষ্ট হলে বন্দুকের গুলি তাদের আহত করতে পারে। অবস্থার গুরুত্ব আমাকে বিচলিত করে তুলল। সাহস সঞ্চয় করে গুলি ছুঁড়লাম। একটি গভীর আর্তনাদে বাঘ ধরাশায়ী হল। বিশাল জনতার জয়ধ্বনিতে আমার বিহ্বলতা কেটে গেল। বন্ধুর সৌজন্যের বিনিময়ে তাঁকে আমি ব্যাঘ্রচর্ম্মটি উপহার দিলাম, যদিও রীতি অনুসারে এটি বাঘ নিহতকারীর প্রাপ্য !

বছর দুই এখানে থাকার পর আমাকে অন্যত্র যেতে হল। আমি শ্রমিকদের আন্তরিক সহযোগিতা সর্বত্রই পেয়েছি। তাদের শ্রদ্ধামিশ্রিত ভালবাসা থেকে আমি কখনও বঞ্চিত হইনি। বাগান ত্যাগ করার কালে তারা আমাকে যে অভিনন্দন দিয়েছিল তা আমার জীবনের সম্পদ হয়ে রয়েছে। তাদের স্নেহের উপহার যতই অকিঞ্চিৎকর হোক তাদের অন্তরের অর্ঘ্য বলে আমি সব সময়ই তা গ্রহণ করে এসেছি। আমিও তাদের কল্যাণ সাধনের জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করেছি। সব সময় যে সফল হয়েছি তা জোর করে বলতে পারব না। সময় সময় উভয়দিক থেকে বাধা পেয়েছি—কোম্পানীর কার্পণ্য এবং শ্রমিকের কুসংস্কার।

শ্রমিকের ভালবাসার নিদর্শন হিসেবে একটি ঘটনা মনে পড়েছে। বাগানের একটা অংশে প্রায় পাঁচ একর জায়গায় জল নিস্কাষনের উপযুক্ত নালার অভাবে চা-এর গাছগুলি শিকড়

পচে গিয়ে মরণাপন্ন হয়েছিল। এই পাঁচ একরের পরই আরো প্রায় পাঁচ একর কোম্পানীরই সর্ত্তাধীন ধানক্ষেত লোকাল বোর্ডের একটি রাস্তার সঙ্গে মিশেছিল। রাস্তাটা পার হয়ে স্থানীয় এক জমিদারের কিছু জমি একটা বড় খালের পাড় অবধি ছিল বিস্তৃত। আমার পূর্ববর্তী পরিচালক ধানক্ষেত অবধি একটা নামেমাত্র নালা কাটিয়েছিলেন। যেটুকু জল নালা দিয়ে ধানক্ষেতের উপর ছড়িয়ে পড়ত ততটুকুই তাঁর লাভ। কিন্তু ফলে উপর থেকে বালি গড়িয়ে এসে ধানক্ষেতে জমা হয়ে জল নিকাশের রাস্তা ত' রইলই না উপরন্তু জমির উর্বরতাও নষ্ট করে দিল। আমি দেখলাম যদি লোকাল বোর্ডের রাস্তা দু'ভাগে ভাগ করে জমিদারের জমির উপর দিয়ে একটা নালা সেই বড় খালের সঙ্গে যোগ, করে দেওয়া যায়, তা হ'লে জল নিস্কাশনের সমস্যার একটা সমাধান হতে পারে। আমি জমিদার মশাইকে আমার সমস্যার কথা বলে তাঁর সাহায্য প্রার্থনা করলাম—যাতে তিনি তাঁর ছোট্ট জমিটুকুর উপর দিয়ে আমার কল্পিত নালাটা প্রসারিত করতে দেন। জমিদার মশায়ের সঙ্গে যথেষ্ট হৃদ্যতা থাকায় তিনি বিনয়মিশ্রিত সৌজন্যে বললেন, "এ আর এমন বেশী কথা কি। আপনি আমাকে জিজ্ঞাসা না করেও যদি এই সামান্য নালা কাটিয়ে নিতেন তাতেও কি আমি আপত্তি করতাম। আপনি কাজ আরম্ভ করে দিন।"

আমি তখনও অপরিণত অনভিজ্ঞ যুবক। ব্যবহারিক জীবনের অলিগলির সন্ধান তখনও পাইনি। জমিদারের কথায় উৎসাহিত হয়ে যথারীতি অনুমতি নিয়ে লোকাল

বোর্ডের রাস্তা কাটা হল ও ধ্বংসোন্মুখ চা-অঞ্চল থেকে আমাদের নিজস্ব ধান ক্ষেতের ভিতর দিয়ে নালাটিকে এর সঙ্গে মিলিয়ে দেওয়া হ'ল। তারপর জমিদার মশায়ের লিখিত অনুমতির জন্য অপেক্ষা করতে লাগলাম। কিন্তু অপ্রত্যাশিতভাবে একদিন দেখা গেল কাটা নালার মুখে জল নির্গমনের পথ রুদ্ধ করে প্রকাণ্ড একটি বাঁধ। বাঁধের পাহারায় চারজন জমিদারের লোক ও একজন কনেষ্টবল। বুঝলাম, রাত্রের অন্ধকারে বাঁধ দিয়ে এই ব্যবস্থা হয়েছে। আমি সেদিন কার্যান্তরে বাগানে অনুপস্থিত। শ্রমিকরা জমিদারের অভিসন্ধি হৃদয়ঙ্গম করতে না পেরে বাঁধ কেটে দেওয়ার সিদ্ধান্ত করল। কিন্তু বাঁধ কাটার কোন প্রয়োজন ছিল না, কারণ বর্ষার জলের গতিবেগ বাড়লে জল আপন পথ আপনি খুঁজে নিত এই নরম মাটির বাঁধের ভিতর দিয়েই। আর জমিদারের পক্ষে বাঁধের উপর বারমাস পুলিস মোতায়েন রাখাও সম্ভবপর ছিল না। যে কোন সময় অতর্কিতে বাঁধ কাটা চলত। আমার প্রতি তাদের প্রীতির জন্য ঐভাবে বিনা বাধায় বাঁধ থাকতে দেওয়া আমার পক্ষে অসম্মানজনক বিবেচনা করে কয়েকজন যুবক-শ্রমিক পুলিস ও জমিদারের লোকের বাধা নিষেধ না মেনে বাঁধটি ভেঙ্গে দিয়ে এল। জমিদারের অভিসন্ধি সফল হল।

সে সময় জমিদারের আচরণ আমার কাছে দুর্বোধ্য ছিল। কিন্তু পরে যখন শুনলাম যে, তিনি মামলাবাজ ও তাঁর চক্রী মন সব সময়ই অন্যের সঙ্গে বিরোধ সৃষ্টির সূত্র অনুসন্ধানে ব্যস্ত, তখন আমার কাছে ব্যাপারটি সুস্পষ্ট হল। পুলিস তদন্তে

এসে সংশ্লিষ্ট শ্রমিকদের নিয়ে টানা হ্যাঁচড়া করতে চাইলে আমি জানিয়ে দিলাম যে, আমার আদেশে একাজ হয়েছে। আজ্ঞাকারী বলে প্রধান অভিযোগ আমার বিরুদ্ধে হওয়া উচিত। যা হোক, স্থানীয় সম্ভ্রান্ত কয়েকব্যক্তি ও মহকুমার ব্যবহার-জীবিদের মধ্যস্থতায় মামলার আপোষে নিস্পত্তি হয়।

এই সময় বাধ্য হয়ে আমার এক বন্ধুর আগ্রহাতিশয্যে তার নিজস্ব বাগানের ভার আমাকে নিতে হল। অনেক চেষ্টায় আগের বাগানে যে পরিবেশের সৃষ্টি করে এনেছিলাম তাকে ছেড়ে যেতে মনে ব্যথা অনুভব করলাম। শ্রমিকদের মনেও তার প্রতিচ্ছবি দেখতে পেলাম। বন্ধুর যে বাগানে আমি এলাম সে বাগানটি অপ্রত্যাশিতভাবেই তার স্বত্বাধিকারে এসেছিল। তিনি সামান্য লেখাপড়া শিখে খুবই তরুণ বয়সে চা-বাগানে সামান্য চাকরি গ্রহণ করেন ও ক্রমে বড়বাবুর উচ্চপদে উন্নীত হন। ১৯২০-২১ সালে চা শিল্পের এক দারুন সঙ্কটের সময় এই বাগান অ্যালায়েন্স ব্যাঙ্ক অফ শিমলার কাছে দায়াবদ্ধ ছিল। আমার বন্ধু তখন এই বাগানেই বড়বাবু।

ব্যাঙ্কটি লিকুইডেশনে গেলে ব্যাঙ্কের তরফ থেকে প্রাপ্য পরিশোধের কড়া তাগিদ পেয়ে বাগানের ইউরোপীয় কর্তৃপক্ষ বাগানটি বিক্রী করার সঙ্কল্প করেন। বড়বাবু সব অবস্থা পর্যবেক্ষণ করে যাচ্ছিলেন। বাগানটি কিনে নেওয়ার ইচ্ছে হল তাঁর, কিন্তু সবচেয়ে বড় বাধা অর্থের অভাব। বাগানের অধীনে প্রায় পঞ্চাশ বিঘে ধানের জমি ছিল বড় রাস্তার দু পাশে। তিনি সেই অঞ্চলের কয়েকজন সম্পন্ন কৃষক গৃহস্থের সঙ্গে আলাপ করে ঠিক করলেন যে বাগানটি তাঁর নামে ক্রয় করার

বায়নানামা সম্পন্ন হওয়ামাত্র তারা ঐ পঞ্চাশবিঘে জমি পঞ্চাশ হাজার টাকা দামে ক্রয় করার শর্তে চুক্তিপত্র স্বাক্ষর করবে ও ধার্যমূল্যের সব টাকা অগ্রিম দেবে।

এই আশ্বাস পেয়ে বন্ধুবর কোম্পানীর কোলকাতা অফিসে গিয়ে সেখানে কর্তৃপক্ষের সঙ্গে আলোচনা করে ঠিক করলেন বাগানটি বার্ষিক বার হাজার টাকা আয়ের ভূসম্পত্তি সমেত এক লক্ষ টাকায় কেনার দশ হাজার টাকা অগ্রিম দিয়ে বাকী টাকা দুই কিস্তিতে পরিশোধ করতে হবে ঠিক হল। প্রথম কিস্তি, আবশ্যক দলিল সম্পাদানের সঙ্গে সঙ্গে ও দ্বিতীয় কিস্তি, দলিল সম্পাদনের ছ'মাস মধ্যে। কোলকাতা থেকে ফিরে এসেই বন্ধুটি পূর্বোক্ত কৃষকদের সঙ্গে পূর্ব বন্দোবস্ত মত পঞ্চাশ হাজার টাকা আদায় করলেন ও এই টাকা থেকেই প্রথম কিস্তির সর্ত পালন করলেন। এর পরে তিনি চা বিক্রী করে করে বাকী দেয় টাকা পরিশোধ করেছিলেন। বাগান কিনতে প্রকৃতপক্ষে তাঁর নিজের কাছ থেকে কোন টাকা পয়সা দিতে হয়নি।

বড়বাবু থেকে বাগানের স্বত্বাধিকারী হয়েও তাঁর কোন পরিবর্ত্তন দেখিনি। তিনি নিরহঙ্কারী, পরোপকারী ও শ্রমিকদের যথার্থ মঙ্গলকামী ছিলেন। তাঁর মত উদারচেতা তখনকার দিনে খুব কমই ছিল। আজ সেই বন্ধু ও তাঁর একমাত্র পুত্র উভয়েই ইহলোক থেকে বিদায় নিয়েছেন। তিনি তাঁর পিতামাতার স্মৃতি রক্ষার্থে ও জনসাধারণের কল্যাণে বিপুল অর্থব্যয়ে উচ্চ ও মধ্য ইংরেজী বিদ্যালয় স্থাপন করে ছিলেন নিজের বাগানে।

এই বাগানে থাকার সময় কয়েকটি অবিস্মরণীয় ঘটনা ঘটে।

এখানে আসার পর আমার শিকারের আগ্রহ অত্যন্ত বেড়ে যায়। একদিন ঘুরতে ঘুরতে একটি হরিণ দেখলাম এঅঞ্চলে শৃঙ্গবিহীন একশ্রেণীর হরিণ আছে! দূর থেকে স্থির করা কঠিন মৃগ কি মৃগী। আমি হরিণটিকে লক্ষ্য করে গুলী ছুঁড়ে তাকে ধরাশায়ী করলাম। আমার সঙ্গের লোক যখন মৃত হরিণটি বাংলোয় নিয়ে এল তখন টের পেলাম সেটী হরিণী। সঙ্গের লোকটিকে মৃত হরিণটী উপহার দিলাম কারণ হরিণীর মাংস খেতে আমাদের প্রবৃত্তি হল না। সে পরে এসে জানাল যে হরিণীটির পেটে একটি মৃত বাচ্চা পাওয়া গেছে। আমার স্ত্রী তখন অন্তঃসত্ত্বা। এই ঘটনার কিছুদিন পরই আমাদের একটি মৃত সন্তান ভূমিষ্ট হয়। এ ঘটনা দুটির সাদৃশ্য আমাদের উভয়কে অভিভূত করেছিল।

আমাদের প্রচ্ছন্ন সংস্কার ক্রিয়াশীল হয়ে উঠল ও পরিতাপের আগুনে আমরা দগ্ধ হতে লাগলাম। তখন থেকে প্রতিজ্ঞা করলাম জীবনে আর হরিণ শিকার করব না।

এর কিছুদিন পরই একটি শ্রমিক একদিন খবর নিয়ে এল বাঘে তার একটা গরুকে মেরে চা আবাদের ভিতর রেখে গেছে! আমি তখন ঘটনাস্থলে গিয়ে একটা গাছের উপর মাচা বাঁধলাম। সন্ধ্যার অন্ধকারে আমি সঙ্গে একজন লোক নিয়ে মাচানের উপর উঠে বাঘের আগমন প্রতীক্ষা করতে লাগলাম। লোকটির হাতে একটি শক্তিশালী বৈদ্যুতিক মশাল আলো আর আমার হাতে শক্তিশালী বন্দুক। রাত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বাঘের আগমন টের পাওয়া গেল। তখনই মশালের আলো বাঘের উপর নিক্ষিপ্ত হল, আর আমার

বন্দুকটিও গর্জে উঠল। তারপরই গভীর নিস্তব্ধতা। বন্দুকের আওয়াজে লোকজন এলে মৃত গরুর কাছে গিয়ে দেখা গেল বাঘের কোন চিহ্ন নেই। কিন্তু গরুর মৃত দেহটির কতক অংশ বাঘের পেটে গিয়েছে। আমরা হতাশ হয়ে ফিরে এলাম। তিনদিন পর কয়েকজন শ্রমিক রুদ্ধশ্বাসে আমার কাছে এসে জানাল যে তারা কাঠ আনতে জঙ্গলে ঢুকে দেখতে পায় একটি বাঘ শুয়ে রয়েছে ও তার চারপাশে রক্ত ছড়ান। খবর পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ৩।৪ জন শ্রমিককে আমার অনুসরণ করতে বলে বন্দুক নিয়ে বেরিয়ে পড়লাম। আমার আর তখন সন্দেহ রইলনা যে আমাদের পূর্ব্ব পরিচিত ব্যাঘ্র মহাশয় গুলী খেয়ে আহত অবস্থায় জঙ্গলে হয় চলচ্ছক্তিহীন হয়েছেন না হয় আঘাতের বেদনা উপশমের জন্য বিশ্রাম করছেন।

শ্রমিকদের নির্দিষ্ট স্থানে বাঘকে পেলাম না, কিন্তু সেখান থেকে তার ক্ষত স্থানের রক্ত-চিহ্ন ধরে অগ্রসর হতে থাকলাম। খানিকদূর এইভাবে যাওয়ার পর স্পষ্ট দেখতে পেলাম বাঘ এই জঙ্গল থেকে বেরিয়ে একটু খোলা জায়গা দিয়ে অন্য একটি জঙ্গলে প্রবেশ করল। আমিও তার পিছনে পিছনে তার নূতন আশ্রয়স্থলে এলাম। বাঘের গায়ের উৎকট গন্ধ এসে নাকে লাগছে, কিন্তু বাঘ তখনও চোখের আড়ালে। আমি তখন একটা বেত ঝোপের আড়ালে। আমার ধারণা হল বাঘ কাছেই কোথাও আছে। আমি বেত ঝোপটা ঘুরে যেই অন্যপাশে গেছি বাঘ গভীর গর্জনে উঠে দাঁড়াল আর আমিও চক্ষের নিমেষে গুলী করলাম। আমার ও বাঘের মধ্যে পাঁচ ছ হাতের বেশী দূরত্ব ছিল না! বাঘের হুঙ্কারে আমার সঙ্গের শ্রমিক

তিনজন ভয়ে উর্দ্ধশ্বাসে দৌড়তে লাগল। তার মধ্যে দুজন একটী ছোট টীলার উপর আশ্রয় নেয়।

তৃতীয় ব্যক্তি বাগানের স্বত্বাধিকারী আমার বন্ধু ও আমার স্ত্রীর কাছে ছুটে গিয়ে আকুলভাবে কাঁদতে কাঁদতে বলে বাঘের মুখোমুখি হতেই বাঘের কর্ণবিদারক গর্জনে সে আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে ছুটে আসছে। এখনও সাহেব বেঁচে আছে কিনা সে বলতে পারে না। তাঁরা দুজনে তখন জঙ্গলের ভিতর কোথায় আমাকে খুঁজে পাওয়া যায় এই সমস্যা সমাধানের চেষ্টায় ব্যস্ত ছিলেন। উপর্যুপরি বন্দুকের কয়েকটা আওয়াজ ইতিমধ্যে তাঁদের কানেও পৌঁছেছিল! কারণ প্রথম গুলী বাঘের পেটে লাগায় বাঘ হুমড়ি খেয়ে পড়ে গিয়েছিল। তখনও তার মৃত্যু হয়নি। আমার বিপরীত দিকে মাথা পড়ায় আমি ঝোপটা আবার প্রদক্ষিণ করে বাঘের মাথা লক্ষ্য করে দ্বিতীয়-বার গুলী করি। তাতেই বাঘের মৃত্যু ঘটে। উত্তেজনার বশে বাঘ নিহত হওয়ার পরও আরও একটা গুলী হয়ত ছুঁড়ে থাকব। কারণ আমার স্ত্রী ও বন্ধু পরে বলেছিলেন যে, তাঁরা তিনটি আওয়াজ শুনেছিলেন। বন্দুকের আওয়াজে অনেক শ্রমিকও ঘটনাস্থলে সমবেত হয়েছিল। আমার বন্ধুটি এসেই আমাকে গভীর আলিঙ্গনে জড়িয়ে ধরলেন। আনন্দাশ্রুতে ভরা তাঁর দুটি চোখ। হায়! তখন কি জানতাম এই তাঁর শেষ আলিঙ্গন।

মৃত বাঘটিকে পরীক্ষা করে দেখা গেল তার কোমরের পাশে বন্দুকের গুলীর আঘাত-জনিত একটি পুরনো ক্ষত। এই গুলীই মাচান থেকে করা হয়েছিল। শ্রমিকরা বাঘের

মৃতদেহটি বয়ে নিয়ে এল। বাঘ শিকারের খবর পেয়েই আমার বিশিষ্ট বন্ধু তখনকার মহকুমার হাকিম চামড়াটি চেয়ে পাঠালেন। আমার স্ত্রী এই বলে আপত্তি করলেন যে, আমার জীবন বিপন্ন করে যে বাঘ শিকার করেছি, তার চামড়া তিনি কিছুতেই হস্তচ্যুত করবেন না। যা হোক শেষ পর্য্যন্ত বন্ধুপ্রীতিই জয়লাভ করল। এই শিকারের পর বন্ধুর কাছে অঙ্গীকারবদ্ধ হতে হয়েছিল আঘাতপ্রাপ্ত বাঘকে আর এরূপ অরক্ষিতভাবে অনুসরণ করব না। প্রতিজ্ঞাটি রক্ষা করে আসছি।

আমি এই বাগানে আসি ১৯২৮-এ আগষ্ট মাসে। পরের বছর জুন মাসে লুসাই পাহাড়ে প্রবল বৃষ্টি হয়ে কাছাড় জেলা ভীষণভাবে বন্যাপ্লাবিত হয়। বন্যার প্রকোপ হাইলাকান্দি মহকুমায় ভয়াবহ আকারে দেখা দেয়। আমাদের বাগানটিও ছিল এই মহকুমায়। দু তিনটি বাগানের সমতল ভূমির আবাদ একেবারে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল বন্যায়। বাকী বাগানগুলির অধিকাংশ চা-এর আবাদ নষ্ট হল। বিশাল সমুদ্রের মত জলরাশি চারিদিকে থৈ থৈ করছে। প্রবল স্রোতের টানে কত কুটিরের ভগ্নাংশ, কতশত মৃত পশু, এমন কি ঘন বনের অংশ যে ভেসে গেল তার ইয়ত্তা নেই। মানুষ পশু সকলেই আশ্রয়চ্যুত। চারদিকে বিরাট হাহাকার।

আমাদের বাগানে বন্ধুর বাংলো ও কতক শ্রমিক ব্যারাক ছাড়া আর সবই তখন জলমগ্ন। এমন কি অপেক্ষাকৃত উঁচু জমিতে অবস্থিত চা-ঘরেও, যেখানে কলে চা তৈরী হয়, বন্যার জল প্রবেশ করল। দলে দলে নিকটবর্ত্তী গ্রামবাসীরা

আশ্রয়প্রার্থী হয়ে আসছে চতুর্দিক থেকে কয়েকখানা নৌকা সংগ্রহ করে কয়েকজন শ্রমিকের সহযোগিতায় বিপন্ন গ্রামবাসীদের উদ্ধারের কাজ সুরু হল। মিনিটে মিনিটে তখন জল বাড়ছে। যেদিকে চলেছি তার পাশ দিয়েই নদী, কিন্তু নদীর চিহ্নরেখা বিলুপ্ত। ভ্রমক্রমে নদীতে গিয়ে পড়লে চোরা স্রোতে নৌকা ও জীবন বিপন্ন হওয়ার আশঙ্কা। এমন বিপজ্জনক অবস্থায় উদ্ধারের কাজ চলতে লাগল। অসংখ্য কুকুর, বিড়াল ও নরনারী অর্ধমগ্ন কুটিরের চালে আশ্রয় নিয়েছে! গরু, বাছুর, ছাগলকে তাদের অদৃষ্টের হাতে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। ভাসতে ভাসতে যদি কোথাও আশ্রয় পায় ভাল, না হলে চরম পরিণতি। সম্পূর্ণ মগ্নপ্রায় মনুষ্য একটি কুটিরের চালে একটি বিড়ালের করুণ আর্ত্তনাদ ও আতঙ্কিত দৃষ্টি হঠাৎ আমার চোখে পড়ল। তাকে নৌকায় না নিয়ে পারলাম না। এইভাবে সমস্ত দিন উদ্ধারের কাজ চলল। তারপর উদ্ধারপ্রাপ্তদের আশ্রয়ের ব্যবস্থা। দুই বাংলোর টিলাতে ও অন্যান্য উঁচু জায়গাতে এদের বাসের বন্দোবস্ত করা হল। বাগানের মজুত চাল ও ডাল দিয়ে চলল সাত দিনব্যাপী খিচুড়ি আহার। পাঁচ দিনে সমস্ত অঞ্চলটিকে বিধ্বস্ত করে দিয়ে বন্যার জল নেমে গেল। সাত দিনের দিন আশ্রয়প্রার্থীদের নিজের নিজের জায়গায় পাঠিয়ে দেওয়া হল।

আর এই সময়েই বিশেষভাবে হৃদয়ঙ্গম করতে পারলাম বাগানের মালিক অর্থাৎ আমার বন্ধুটির হৃদয়ের প্রশস্ততা। বন্যার জল সরে যাওয়ার পর সমস্যা দাঁড়াল সর্বহারাদের

পুনর্বসতির। সরকারী সাহায্য আসতে অনেক সময় লাগবে। বাইরে থেকে বে-সরকারী সাহায্য পাওয়াও সময়সাপেক্ষ। এইসব বিবেচনা করে বন্ধুর সঙ্গে আলোচনা করে স্থির করলাম কাছাকাছি কয়েকটি গ্রামের সাহায্য ও পুনর্বাসনের কাজ তখনই আরম্ভ করা দরকার। বন্ধুটি মুক্তহস্তে তাঁর জঙ্গলের সমস্ত সম্পদ এ কাজের জন্য নিয়োগ করলেন। গ্রামবাসীদের অনেক কুটির বন্যার প্রবল স্রোতে ভেসে গিয়েছে। সমস্ত দেখে শুনে অগ্রাধিকারের বিচারে একটা তালিকা প্রস্তুত করা হলো। বাগানের সুবিশাল বনভুমি থেকে ঘর তৈরীর সরঞ্জামের জন্য অনুমতিপত্র গ্রামবাসীদের মধ্যে বিতরণ করা হল। এছাড়া মজুরদের জন্য মজুত ভাণ্ডার থেকে যথাসম্ভব কম্বল, ধান, চাল গ্রামবাসীদের ব্যবহারের জন্য বরাদ্দ করা হলো। অর্থ-সাহায্যও বড় কম হয়নি। এই কাজের জন্য বন্ধুকে কিছু ঋণও করতে হয়েছিল। গ্রামবাসীরা এ সাহায্য সেদিন না পেলে অসহায় অবস্থার মধ্যে পড়ে জীবন মরণ সমস্যার সম্মুখীত হতে হতো তাদের।

এইসব সাহায্যের কাজ অনেকটা অগ্রসর ও সুশৃঙ্খল হওয়ার পর আমি বন্যাপীড়িত অঞ্চলের অবস্থা দেখবার জন্য মোটর-যোগে মহকুমা শহর হাইলাকান্দি হয়ে শিলচর মাতুলালয়ে গেলাম। শিলচর থেকে উনিশ মাইল দূরে মূল পি ডব্লিউ ডির রাস্তা একটা ইউরোপীয় বাগান প্রদক্ষিণ করে আমার বাগান হয়ে সেখান থেকে বিশ মাইল দূরে লুসাই পাহাড়ের পাদদেশ অবধি চলে গেছে। এই উনিশ মাইলের বাঁক থেকে আর একটা ফাঁড়ি রাস্তা সোজাসুজি ঐ একই ইউরোপায়

বাগানের ভিতর দিয়ে পি ডব্লিউ ডির মূল রাস্তাটির সঙ্গে সংযুক্ত হয়েছে। এটা বাগানের জমির উপর অবস্থিত ও বাগানের অর্থব্যয়েই নির্মিত। রাস্তা দিয়ে সর্ব্বসাধারণের যাতায়াত নিষিদ্ধ কিন্তু রাস্তার উপর একটা লোহার বড় পোল আছে সেটা তৈরী করতে ঐ অঞ্চলের অন্যান্য বাগানের কাছে থেকে অর্থসাহায্য গ্রহণ করা হয়েছে। আমার বাগানেরও এই বাবদ একটি সামান্য কিছু দান ছিল। এই রাস্তা দিয়ে আমার এবং অন্যান্য বাগানের দূরত্ব কমে যায় প্রায় দুই মাইল। এই সুবিধাটুকু পাওয়ার জন্যই অর্থদান করা হয়েছিল। সর্বসাধারণের অনধিকার প্রবেশ বন্ধ করার জন্য রাস্তার উপর একটি লোহার প্রবেশদ্বার স্থাপিত ছিল। রাস্তার দুই পাশে তারের বেড়া দিয়ে ঘেরা চা-এর আবাদ। প্রবেশদ্বারে বাগানের একটি চৌকিদার পাহারায় নিযুক্ত। তার কাছেই সাধারণত প্রবেশ-দ্বারের চাবি থাকত ও প্রয়োজনমত প্রবেশদ্বারের বন্ধ ও মুক্ত করার দায়িত্ব তার উপর ন্যস্ত ছিল। শিলচর থেকে প্রত্যা-বর্ত্তনের পথে আমি আমার গাড়ী এই প্রবেশদ্বারের উপস্থিত হলাম ও চৌকিদারকে দারমুক্ত করতে বললাম। চৌকিদার জানাল, নতুন ম্যানেজার তার কাছ থেকে চাবি নিয়ে গেছে ও কারো ভিতরে প্রবেশ করার প্রয়োজন হলে তাকে জানাতে বলেছে। স্থায়ী ইংরেজ ম্যানেজার ছুটিতে বিলেত গেছে ও তার স্থলে অন্য একটি ইংরেজ ম্যানেজার আসামের নওগাঁর একটি বাগান থেকে অস্থায়ীভাবে সেখানে এসেছিল জানতাম। নতুন ম্যানেজারটি বদমেজাজি ও অভদ্র এ অপবাদও শুনেছিলাম পুরনো ম্যানেজারের সঙ্গে আমার সৌহার্দ্য ছিল। এবং নতুন

ম্যানেজারের সঙ্গে সাক্ষাৎ পরিচয় তখনও ঘটে ওঠেনি। চৌকিদারকে ম্যানেজারের কাছে পাঠিয়ে দিয়ে অপেক্ষা করছি, এমন সময় দূরে একখানা মোটর দেখতে পেলাম, আমাদের দিকেই আসছে। নতুন ম্যানেজারটি কাছাকাছি এসেই উদ্ধতভাবে বলে উঠল, "জানো এটা সর্বসাধারণের রাস্তা নয়! এ রাস্তা দিয়ে যাওয়ার কোন অধিকার নেই তোমার।"

আমি বললাম, "আমার সঙ্গে ওভাবে কথা বলার তোমারও কোন অধিকার নেই, তা তুমি জানো ?"

দেখলাম তার চোখেমুখে ক্রোধের ভাব ফুটে উঠল। সে বলল, "আমি কিছুতেই এ ফটক পার হতে দেব না।"

তার এই প্রতিদ্বন্দ্বিতার মনোভাব দেখে আমি আমার গাড়িখানাকে আড়াআড়ি ভাবে প্রবেশদ্বারের সামনে রাখতে আদেশ করলাম, যাতে সাহেব ফটক অতিক্রম করে এসে গাড়ি হাঁকিয়ে যেতে না পারে। কারণ তার পরিহিত পোশাক দেখেই আমি বুঝেছিলাম যে, কোথাও যাওয়ার জন্য প্রস্তুত হয়ে সে এসেছে। আমার কথামত গাড়ি রাখা হলে আমি সাহেবকে বললাম, "তুমি এখানে নতুন লোক, অধিকারের প্রশ্ন তোলার আগে তোমার জানা উচিত ছিল তোমার রাস্তার উপরের পোলটি কাদের অর্থসাহায্যে ও কি সর্তে হয়েছিল। আমিও সাহায্যকারীদের মধ্যে একজন। সুতরাং এ রাস্তা ব্যবহার করার সম্পূর্ণ অধিকার আমার আছে। যদি ভাল কথায় না দাও, আমার বাগান ও সাহায্যকারী আরো তিনটি দেশীয় বাগান আদালতে তাদের অধিকার প্রতিষ্ঠিত করতে কুণ্ঠিত হবে না।"

আমাদের এরকম বাদানুবাদ চলার সময় ঐ বাগানেরই অনেকগুলি শ্রমিক চারদিকে সমবেত হয়েছিল। সাহেব ক্রোধে ক্ষিপ্তপ্রায় হয়ে এইসব শ্রমিকদের হুকুম করল আমার গাড়ি ঠেলে সোজা করে দিতে কিন্তু শ্রমিকদের নীরব নিশ্চল দেখে সে আরো ক্ষিপ্ত হয়ে উঠল। আমি তখন ব্যঙ্গ হাস্যে বললাম, "তুমি কি মনে কর 'গিরমিট কুলির' দিন এখনও আছে যে, শ্রমিকরা কলের পুতুলের মত তোমার আজ্ঞা পালন করবে? তারা এখন বুঝতে পারে, আমি তাদের আপন স্বদেশবাসী আর তুমি বিদেশী। তুমি এখন আর তাদের চোখে সর্ব্বশক্তিমান প্রভু নও যে, তোমার হুকুম নির্বিচারে মেনে চলবে। আমার নিজের মাটিতে আমার মর্যাদা কতটুকু আর এই মাটিতে তোমারই বা মর্যাদা কতটুকু তা তারা এখন বুঝতে পারে।"

শ্রমিকদের এ অটল অবস্থায় নিজেকে অসহায় মনে করে সে শেষকালে ফটক খুলে দিয়ে আমাকে শাসাতে লাগল, "সাবধান, আর যেন এ দ্বার অতিক্রম করতে এসো না।"

আমি হাসিমুখে জবাব দিলাম, "আদালতে দেখা যাবে।"

মোটর চালককে গাড়ি চালাতে ইঙ্গিত করলাম। সাহেবও ফটক বন্ধ করে বিপরীত দিকে চলে গেল।

কিছুদূর এসে দেখলাম, বাগানের অফিসঘরের সামনে অনেক লোক জমা হয়েছে। তাদের মুখে আনন্দের দীপ্তি। জনতা দেখেই আমি উপলব্ধি করলাম যে, সাহেব ও আমার মধ্যে বিরোধ সংবাদ ইতিমধ্যেই এসে পৌঁছে গেছে। বাগানের শ্রমিকরা আর তাদের পুরোভাগে বাগানেরই বড়বাবু। বড়বাবু এগিয়ে এসে বললেন, "ব্যাটাকে খুব জব্দ করেছেন।

কিন্তু শুধু এতেই হবে না। কোলকাতার কোম্পানীতে লিখে সাহেবের উপযুক্ত শিক্ষার একটা ব্যবস্থা করুন। সকলকে জ্বালিয়ে খাচ্ছে।"

বুঝলাম, সাহেবের বিরুদ্ধে রয়েছে ঘনীভূত অসন্তোষ। আমি বাগানে ফিরে যথাবিহিত করার প্রতিশ্রুতি দিয়ে চলে এলাম। বাগানে এসেই আমি এই ইউরোপীয় বাগানের কর্তৃপক্ষকে ঘটনার বিবরণ দিয়ে চিঠি লিখি ও সাহেব ম্যানেজারের বিরুদ্ধে আমার অভিযোগ জানাই। কোম্পানী শুধু আমার চিঠির প্রাপ্তি স্বীকার করল। কিন্তু দিন কয়েক পরে ক্ষমা প্রার্থনা করে ম্যানেজারের একখানা চিঠি পেয়ে বুঝলাম যে ঔষধ প্রয়োগ হয়েছে। এর কিছুদিন পরে শুনলাম, তার জায়গায় নতুন আর একজন ম্যানেজার নিযুক্ত হয়েছে।

এ কয়েক বৎসরে শ্রমিকদের মানসিক পরিবর্ত্তনে আমি অত্যন্ত আনন্দ অনুভব করলাম। আর যাঁর কল্যাণে এটা সম্ভবপর হয়েছিল সেই মহাত্মার উদ্দেশ্যে আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানালাম। ১৯২২ সালের অভিযান শ্রমিকদের মনে যে বৈপ্লবিক জাগরণ এনেছিল, তাসত্যিই। বিস্ময়কর অভূতপূর্ব এক, আত্ম-প্রত্যয় জাগ্রত হয়ে শ্রমিকদের মনে বিপুল বল সঞ্চার হয়েছিল।

শ্রমিকদের মন থেকে সঙ্কোচ কাটাবার জন্য আমি আমার বাগানে শ্রমিকদের একটি ফুটবল ক্লাব ও অভিনয়ের জন্য একটি নাট্যমঞ্চ করে দিলাম। তাদের উৎসাহ দেওয়ার জন্য বাগানের

কর্ম্মচারীরা ও আমি নিজেও কিছুদিন শ্রমিকদের সঙ্গে খেলেছি ও অভিনয় করেছি। তারপর থেকেই প্রতিবেশী প্রায় সব বাগানেই 'ফুটবল ক্লাবের' প্রচলন হল। সময় সময় পরস্পরের মধ্যে প্রতিযোগিতার অবতারণাও হত। প্রতি বৎসর দুর্গাপূজা ও কালীপূজার সময় বাগানে অভিনয় চলত। বাগানের শ্রমিক, কর্মচারী ছাড়াও পেশাদার অভিনেতা ও ছোট ছোট ছেলেরা নাচের জন্য পারিশ্রমিক নিয়ে অভিনয়ে যোগ দিত। প্রেক্ষাগৃহ লোকে লোকারণ্য হয়ে যেত সে-সময়। অভিনয় ও খেলার মাধ্যমে শ্রমিক ও মালিকের মধ্যে যে দূরত্ব ছিল তা ক্রমেই দূর হয়ে আসতে লাগল, আর শ্রমিকদের মনে নতুন নতুন ভাবধারা আনাগোনা করতে থাকল। এই বাগানে মালিক ও শ্রমিকের পারস্পরিক ব্যবহারে প্রথম থেকেই একটা বৈশিষ্ট ছিল। স্বত্বাধিকারী বাগানের বড়বাবু থেকে সেই বাগানেরই মালিক হওয়াতেই বোধহয় পরস্পরের মধ্যে সঙ্কোচহীন ঘনিষ্ঠতা গড়ে উঠেছিল। শ্রমিকরা মালিককে পালক হিসাবেই গণ্য করত ও মালিক শ্রমিকদের দাস না ভেবে আশ্রিত বলেই মনে করতেন। শ্রমিকরা মালিককে 'রাজা' বলে সম্বোধন করতে আর মালিক শ্রমিকদের রাজোচিত বদান্যতার সঙ্গে পালন করতেন। এই নিঃসঙ্কোচ মেলামেশা সত্বেও শ্রমিকদের কাজে কোনদিন কোনরূপ শৈথিল্য লক্ষ্য করিনি।

এ অঞ্চলে এক সহৃদয় ইংরেজের পরিচয় পাই। আমারই কর্ম্মক্ষেত্রের কাছে একটি ইউরোপীয় বাগানে এই ইংরেজটি অতি তরুণ বয়সে সহকারী পরিচালকের পদে সরাসরি বিলেত

থেকেই নিযুক্ত হয়ে আসেন। যৌবনে যৌনক্ষুধার তাড়নায় তিনি একটি শ্রমিক যুবতীকে রক্ষিতা হিসেবে গ্রহণ করেন। পরে ইংরেজ যুবক ঐ বাগানেরই পরিচালক পদে উন্নীত হন। রক্ষিতা তখনও তাঁর সঙ্গে বাস করেছে। পরিণত বয়সে তাঁর মনে রক্ষিতার ভবিষ্যৎ জীবন সম্বন্ধে উৎকণ্ঠা জেগে ওঠে। স্বজাতীদের প্রবল বিরোধিতা সত্বেও তিনি এই রমণীকে খ্রীষ্ট ধর্ম্মমতে বিবাহ করেন। এই বিবাহের পূর্বেই তিনি বাগানটি নিজে ক্রয় করেন। এবং স্বদেশে ভাইবোনের দাবী অগ্রাহ্য করে মৃত্যুকালে এই সম্পত্তিটি তিনি তাঁর এই-দেশীয় স্ত্রীকে দিয়ে যান। শ্রমিকদের লাভের অংশ দেওয়ার রীতি তাঁর বাগানে তিনিই প্রথম প্রবর্তন করেন ও এই রীতি এখনও বর্ত্তমান আছে।

১৯৩০ সালের ঘটনা। হোলি উৎসবের দিন ৮।৯ বৎসর বয়স্ক একটি শ্রমিকদের একটি ছেলে একজন পথচারী মুসলমানের গায়ে ও দাড়িতে রং মাখিয়ে দেয়। সে আমার কাছে অভিযোগ করাতে আমি ছেলেটিকে ও তার বাবাকে ডাকিয়ে এনে মুসলমান লোকটীর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করাই। সে সন্তুষ্ট হয়ে চলে যায়, কিন্তু গ্রামে ফিরে যাওয়ার পর তার স্বধর্মীরা তাকে উত্তেজিত করে তোলে। বিকালে অপর কয়েকজন মুসলমানের সঙ্গে সে আবার আমার কাছে আসে ও সঙ্গীদের প্ররোচনায় বলে যে সে সমাজাজচ্যুত হয়েছে ও মৌলবীদের একটা সিন্নী না দেওয়া পর্যন্ত তাকে একঘরে হয়ে থাকতে হবে। সিন্নীর জন্য প্রায় একশত টাকা প্রয়োজন। এই অর্থ তাকে বাগান থেকে দেওয়া হোক।

তখন চারিদিকে হিন্দু মুসলমানদের মধ্যে একটা সাম্প্রদায়িক বিরোধের ভাব চলেছে। মসজিদের সামনে বাজনা ও শোভাযাত্রার বিরুদ্ধে মুসলমানদের আন্দোলন দিন দিন তখন প্রবলতর হয়ে দেখা দিচ্ছে। এমন অবস্থায় হঠাৎ কোন জবাব না দিয়ে আমি বাগানের স্বত্বাধিকারী বন্ধুর সঙ্গে পরামর্শ করে পরের দিন সকালে আমাদের মতামত জানাব বলে বিদায় করে দিলাম।

সকালে তাদের জানালাম যে, অপরাধের তুলনায় ও অপরাধীর বয়স বিবেচনায় ক্ষমা প্রার্থনাই যথোচিত শাস্তি বলে আমরা মনে করি। উত্তর শুনে সেই দিন বিকালে স্থানীয় মুসলমানেরা বাগানের একটি মাঠে সমবেত হয় ও কয়েকজন বক্তা উত্তেজনার ভাষায় কিছু বিদ্বেষপূর্ণ বক্তৃতা দেয়। আমাদের কাছে সঙ্গে সঙ্গে খবর পেঁ ছিয় যে, রাত্রে মুসলমান জনতা বাগান আক্রমণ করবে। আমরা যথোচিত সতর্কতা অবলম্বন করে থানায় পুলিস চেয়ে পাঠালাম ও মহকুমার হাকিমকে অবস্থার গুরুত্ব সম্বন্ধে জানাতে অনুরোধ করলাম। তা ছাড়া জেলার শাসনকর্তাকেও একখানা জরুরী টেলিগ্রাম করে দিলাম। যা হোক, সে রাতে আর কোন দুর্ঘটনা ঘটল না, কিন্তু স্থানীয় হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে মন কষাকষি সুস্পষ্ট হয়ে হয়ে উঠল।

পরের দিন সকালে মহকুমা হাকিম নিজে এসে উপস্থিত। এসেই তিনি কয়েকজন মুসলমান প্রতিনিধিকে ডেকে পাঠালেন ও তাঁর সঙ্গে ডাক বাংলোয় দেখা করার জন্য আমাকে ও আমার বন্ধুকে চিঠি পাঠালেন।

সেখানে পৌঁছনর পর হাকিম সাহেব বললেন, তিনি মুসলমানদের প্রতিনিধিদের সম্মত করিয়েছেন—অর্থের পরিবর্তে হয় আমি না হয় আমার বন্ধু ক্ষমা প্রার্থনা করলেই বিবাদের মীমাংসা হয়ে যাবে।

হাকিমটি একজন অ্যাংলো ইণ্ডিয়ান। তাঁর এই মুরুব্বিয়ানার চালে উত্তেজিত হয়ে বললাম, Had the incident occurred in a European garden, I am sure, you would not have taken the same attitude. তিনি বললেন, I am not to be advised how to maintain peace and order in the locality. It is my responsibility and I can chose my own means.

সাহেবের মনোভাব দেখে আমার সর্বশরীর জ্বলে যেতে লাগল। আমি রাগত স্বরে উত্তর দিলাম, Then my conscience is also absolutely mine and I flatly refuse to apologise.

সাহেব আমাকে শাসালেন।

—Do you know I can put you under arrest for apprehended breach of peace ?

আমি বললাম—I shall be fully prepared to take the consequences.

আমার বন্ধু এই সব কথা কাটাকাটি দেখে ভয় পেয়ে গেলেন। তিনি সাহেবকে বললেন, তাঁর মতামত তিনি বিবেচনা করে একটু পরে জানাবেন। তারপর আমাকে সঙ্গে করে তিনি বেরিয়ে এলেন। বাইরে রাস্তার উপর হিন্দু শ্রমিকরা ও আশেপাশের হিন্দু অধিবাসীরা জমায়েত হয়ে

প্রতীক্ষা করছিল। একজন শ্রমিক সর্দার এসে বললে, "হুজুর, হাকিম সাহেব নাকি আপনাকে গ্রেপ্তার করে তাঁর গাড়িতে মহকুমায় নিয়ে যাবে? আমরা বেঁচে থাকতে, সাহেবের সাধ্য হবে না গাড়ি চালিয়ে যেতে।" "সমবেত সমস্ত শ্রমিক তার কথার প্রতিধ্বনি তুলল। আনন্দে উদ্বেল হয়ে উঠল আমার হৃদয়।

সভাগৃহে ফিরে আসার পর সাহেব আমার বন্ধুকে জিজ্ঞেস করলেন "Any decison ?"

বন্ধু জবাব দেওয়ার আগেই আমি বলে উঠলাম, My decision is final."

তিনি তখন আমাকে সভাগৃহ ত্যাগ করে যেতে বললেন। আমিও শ্রমিকদের নিয়ে বাগানে চলে গেলাম।

আমি চলে আসার পর সাহেব আমার বন্ধুর কাছে প্রস্তাব করলেন, তিনি যেন মুসলমানদের কোন দাতব্য ভাণ্ডারে দান বাবদ পঞ্চাশ টাকা হাকিম সাহেবের কাছে সুবিধেমত পাঠিয়ে দেবেন বলে মুসলমান প্রতিনিধিদের সামনে স্বীকার করেন, তাহলে ব্যাপারটা আপাতত চাপা পড়ে যাবে।

যদিও বন্ধু আমার কাছে প্রকাশ করেন নি তবুও আমার দৃঢ় বিশ্বাস, তিনি এ প্রস্তাবে স্বীকৃতি দিয়েছিলেন। সভায় উপস্থিত একজন থানা কর্মচারীর কাছে পরে শুনেছিলাম সাহেব নাকি আমার বন্ধুকে বলেছিলেন, If you dont immeditely remove this firebrand from your garden he will some day land you into troubles.

১৯৩১ সালে চা-শিল্পের এক দারুণ সঙ্কট মুহূর্তে কতকগুলি চা-প্রতিষ্ঠানের সম্মিলিত অনুরোধে আমাকে উৎপাদনের ক্ষেত্র ছেড়ে চায়ের বিক্রয়ক্ষেত্রের প্রসারের জন্য সমস্ত ভারতবর্ষময় ঘুরে বেড়াতে হয়েছিল। এখানেই শ্রমিকদের সঙ্গে আমার প্রত্যক্ষ সম্বন্ধের ছেদ পড়ে, কিন্তু পরোক্ষ সম্বন্ধের বিরতি কোনদিনই ঘটেনি। পরিদর্শক হিসেবে এর পরেও আমাকে আসামের চা-বাগান অঞ্চলে ব্যাপকভাবে পরিভ্রমণ করতে হয়েছে। আজ ভুললে চলবে না যে, এই শ্রমিক মালিকের মধ্যে বোঝাপড়ার দায়িত্ব শ্রমিকের চেয়ে মালিকেরই বেশি। শ্রমিককেও আজ বিচার করতে হবে তার অতীতের পরিপ্রেক্ষিতে। তাকে বিচার করতে হবে তার অ-শিক্ষা, তার কুসংস্কার, তার আশা-আকাঙ্খা, তার বিশ্বাস-অবিশ্বাসের পটভূমিকাতে। অতীতে স্বদেশীয় সমাজ কর্তৃক অজ্ঞাত, অবহেলিত, বিদেশীয় শাসক ও শোষক দ্বারা নিপীড়িত, বঞ্চিত মানবত্মার ইতিহাসের ভিতর দিয়ে যে পুঞ্জীভুত অবিশ্বাস ও গ্লানি শ্রমিকের মনে নীড় বেঁধেছে, তাকে নির্মূল করতে হবে সহানুভূতি ও সমবেদনার স্পর্শে। তাদের কল্যাণ কামনায় ব্রতী হতে হবে সংস্কারকরূপে নয়, আপন জনের ভূমিকায়। মালিককে সম-স্তরে নেবে আসতে হবে শ্রমিকের মনের সন্ধান নিতে। সুখ-সমৃদ্ধিতে যাকে অংশীদার হতে আহ্বান জানাইনি, আমার দুঃখের অংশভাগী হতে তাকে বলি কোন লজ্জায়? আমি চা-বাগানে থাকতে সব সময়ই এই লক্ষ্য সামনে রেখে চলার চেষ্টা করেছি। শ্রমিককে শুধু যন্ত্রে পরিণত করলে সুফল কিছুই হবে না। তাকে দীক্ষিত করতে

হবে জ্ঞানের মর্যাদা, আত্ম-প্রত্যয়ের, আত্মপ্রতিষ্ঠার ও বিকাশের মন্ত্রে।

তার মূল্য নিরূপণ করতে হবে অর্থে নয়—মানবতার স্নিগ্ধ প্রলেপে।

পরিশিষ্ট

আজ প্রায় এক যুগ পার হয়ে গেছে। অনেক কথা মন থেকে মুছে গেছে। সেদিন যা তুচ্ছ মনে হয়েছিল, ইতিহাসের অমোঘ নিয়মে তাই হয়ে উঠেছে আজ অর্থপূর্ণ, আর সেদিনকার উজ্জ্বল ঘটনাগুলো আজ মনে হয় নিরর্থক।

আমার সেই ফেলে আসা জীবনের ফাঁকে ফাঁকে যে দুঃখ দুর্দ্দশার ছবি দেখেছিলাম, যে গ্লানি আর ক্লেদ জড়ো হয়েছিল চা-বাগানের মাটিতে, বিলাসী শহরবাসীর চায়ের কাপে তার প্রতিচ্ছবিও যেন ভেসে ওঠে।

চাঁদের একটা পিঠ যেমন জ্যোৎস্নায় ধোয়া, তেমনি অন্য পিঠ থাকে অন্ধকার। চা-বাগানের এই অন্ধকার রহস্যময় পৃথিবীটাকেই তুলে ধরতে চেয়েছি। নির্য্যাতিতের নীরব কান্নাকে। আর বাগানের কচি কচি সবুজ পাতার গালিচায় যে বসন্ত বাতাস কেঁপে কেঁপে যেত, অত্যাচার অবিশ্বাসের নীচে যে স্নেহ প্রীতি ভালবাসার মধুময় দিনগুলি নানা রঙে উজ্জ্বল হয়ে ছিল তার স্মৃতিটুকু আমার অভিজ্ঞতার ভাণ্ডারে চির-সম্পদ হয়ে থাক।

সেই আনন্দোজ্জ্বল উৎসব রাত্রি! পৌষ-পার্বণের দিনে কুলিকামিনদের নাচ আর গান।

সারা বছরে এই একটি দিন যেন মুক্তির আনন্দ উপভোগ

করে তারা। জানি না কবে থেকে এই রীতির সুরু, কিন্তু বিস্মিত হবারই কথা যে এই দিনটিতে বাগানের কর্ত্তৃপক্ষের নামে গান বাঁধতেও তারা ভয় পায় না। অনেক সময়ে সে-গানে বিদ্রূপও থাকে।

মনে আছে সে সব দিনের দৃশ্য। 'টুস্‌্ু' দেবীকে রঙিন সাজ পরিয়ে পত্রপুষ্পে সাজানো 'তাজিয়া' নিয়ে বাগানের বাবুদের বাড়ী বাড়ী চলেছে গান গেয়ে বখশিশ আদায় করতে। ভুলে-যাওয়া ফেলে-আসা দিনের টুস্থু গানের কলি হঠাৎ কোনদিন আজও গুণগুণ সুরে বেজে ওঠে কানের পাশে!

আস্তর শাস্তর জানি না সমর গীতা পাঠ করি
গুরুর সঙ্গে তর্ক করে নরকে ডুবে মরি,
লিখাপড়া শিখতে হবে নইলে বিয়ে হ'বে না।
প্রেমিক শুনে মুখ ফিরাবে প্রেমিক কাছে আসবে না॥
এমন সুন্দর পানের খিলি দাও খেয়ে দেখি,
ম্যানেজার বাবুর চারি চালাতে টুড়ি ব্যাঙের কাছারী,
সাপ আসিল ব্যাঙ পালাল ভাঙ্গ্‌ল বাবুর কাচারি॥
টিলা বাবুর তিনটি কোঠা, ধীরে ধীরে বন কাঁটা,
এই ফুলটিকে গড়েছে টিলা বাবুর তিন ব্যাটা॥
ডাক্তার বাবুর কাঁঠাল গাছে প্রিয় পাখী গান করে
সেই পাখীর গান শুনে ডাক্তার বাবু নাচ করে॥
ওগো ওগো ম্যানেজার বাবু তোমার বড় নাম শুনি,
বেলির তলায় কল গাড়ী বাংলোয় জল টানানি।
মাসে শুনি তিন শ' টাকা কলা ফুলের তরকারী॥

কাজ পরিদর্শন করতে গিয়ে শ্রমিক মেয়েদের কাছে পান খাওয়া ও তার জন্য কামিনদের রেষারেষির এই ইঙ্গিত বাবুদের কাছেও ছিল উপভোগ্য।

সক্ষমশরীর মেয়ে আর পুরুষ, দেহে যৌবনের উচ্ছল উন্মাদনা, চোখে মুখে খুশির বন্যা, মনে প্রেমঘন নিবিড় আবেশ, নাচের তালে তালে যেন ছড়িয়ে পড়ত অজস্র প্রাণপ্রাচুর্য্য, গানের সুরে নতুনতর স্বপ্নের ইশারা ঃ

কোথা যেতে চাও টুসু, গয়া কাশী বৃন্দাবন?
ঘরে বসে ভজ টুসু দুয়ারে তোর মধুসূদন।
আশ্বিন মাসে দুর্গা পূজা সবাই পরে লাল শাড়ী
আমার টুসু অবোঝ মেয়ে বোঝাবে বংশীধারী।
বাঁকা নয়, বাঁকা নয় মা, তেরাল বাঁশের আগা গো
বিনা ফুঁকে বাজে বাঁশী, বলে রাধা, রাধা গো
এ বন কাটি ও বন কাটি, কাটি বনের ধ্বজা গো
তেরাল বনের রাণী কাঁদে রাজা যায় বাঁধা গো।

একদিন রঙিন স্বপ্নের নেশাতেই ছুটে এসেছিল যারা, ছুটে এসে দেখেছিল শুধু ব্যথা আর ব্যর্থতা, হতাশা আর গ্লানি, দুঃখ আর দারিদ্র্য; বন্দী পশুর মত স্বেদসিক্ত পরিশ্রমের যূপকাষ্ঠে আত্মবলি দিতে হয়েছিল যাদের, বাস্তব জীবনের অভিশাপ ভোলবার জন্যই হয়তো তারা কোন কোন কামিন মেয়েকে ইঙ্গিত করে গাইত ঃ

জাগো মন্দোদরী! তোর গুণ পাসরিতে নারি ॥
নদীর ধারে নীল বুনিলাম, নীলে সুটি ধরে না

ঘরে আছে ছোট দেবর নীল পাইড় বই পরে না
জাগো মন্দোদরী ॥
নদীর ধারে ধান বুনিলাম, ধান খায় মা হাঁসে গো
হাঁসের বাগাল হাঁস ফিরায় না কেয়াফুলের গন্ধে গো
জাগো মন্দোদরী ॥
বাড়ীর নীচে জোড়া গাছটি, ফল খেতে পাখী আসিতেছে
পাখীর গলায় কণ্ঠীর মালা দেশ ভেঙ্গে লোক দেখিতেছে।
জাগো মন্দোদরী ! তোর গুণ পাসরিতে নারী ॥

মৃত্যুকে ভুলে থাকার ব্যথা মুছে ফেলার এই নাচ আর গানই হয়তো জীবনকে ভালবাসতে শিখিয়েছিল তাদের, শিখিয়েছিল বন্দীর জীবন থেকে মুক্তির জীবনে ফিরে আসার মন্ত্র, আত্মপ্রতিষ্ঠার জয়গান। তাই অভিযোগ থাকত ম্যানেজারের বিরুদ্ধেও, অসময়ে ছুটি দেবার জন্য। বাগানে বাগানে যখন পাতা তোলার মরসুমে ফিরতে সন্ধ্যে হয়ে যায়, তখন ঃ

তাক্, তাক্, তারা কিটি, ম্যানেজার বাবু দিয়েছে মদের ভাটি
ওগো ওগো ম্যানেজার বাবু তোমার বড় নাম শুনি
সন্ধ্যার সময় দেও ছুটি, আমরা ধর্ম্ম দেই ছাড়ি।
রাত্রে আসে অলসতা কিছু আমরা না পারি,
সন্ধ্যা করবার ইচ্ছা আছে সময় হয় বিরোধী।

কিংবা ম্যানেজারের রক্ত চক্ষুকে বাঘের সঙ্গে তুলনা করে বিদ্রূপের গান ঃ

আমার বাগান ফুলের বাগান নূতন নূতন ফল ধরে
রৌদ্রের বেলা সে ফল খেলে গা শুদ্ধ আমার নড়ে।

পারাবত পিঞ্জরের পাখী উড়ে বসে কোন ডালে
ধরগো ধরগো ব'লে শিকলি কেটে যায় চলে।
করিমগঞ্জে দেখে এলাম জলায় জলায় দুধ বিলায়
টুসুর কোলে ছেলে নাই মা কারে দিব দুধ বালাই,
করিমগঞ্জে দেখে এলাম লোহার খুটায় বাঘ বান্ধা
সে বাঘে কি মানুষ খায় মা, দেখ বাঘের তামাসা।

বাগান থেকে শেষ বিদায় নেবার দিনে শ্রমিক বন্ধুদের চোখে যে অশ্রু দেখেছিলাম, সে অশ্রুবিন্দুতে বিচ্ছেদের বেদনা প্রকাশ পেলেও, তাদের ভবিষ্যতের উজ্জ্বল জীবনের প্রতিচ্ছবিও দেখতে পেয়েছিলাম, যে জীবনের স্বপ্ন-রাঙা গান গেয়েছিল তারা। সে-গান আমি ভুলি নি, সে-গান ভোলবার নয়। আজ হঠাৎ কোন কোনদিন তাই তাদের সুরে সুর মিলিয়ে গেয়ে উঠি ঃ

বাঁকা নয়, বাঁকা নয় মা, তেরাল বাঁশের আগা গো
বিনা ফুঁকে বাজে বাঁশী, বলে রাধা, রাধা গো ॥

কিংবা

নদীর ধারে নীল বুনিলাম, নীলে ফুটি ধরে না
ঘরে আছে ছোট দেবর নীল পাইড় বই পড়ে না ॥

আর তারপর চোখের সামনে ভেসে ওঠে কত বিচিত্র ছবি। শৈশব দিনের সেই ঘণ্টাধ্বনি বেজে ওঠে, যে ধ্বনি শুনে আমরা ছোটরা ছুটে যেতাম খাবার ঘরে। দেখতে পাই, একটি ছোট্ট শিশুকে কোলে নিয়ে এসে দাঁড়িয়েছে শ্রমিক রমণী রাধা, চোখে তার আতঙ্কের দৃষ্টি আর আশ্রয়ের প্রার্থনা। মনে পড়ে সেই মাতাল সাহেবের পাগলামি আর নিঃশব্দ নদীর বুকে মাঝির দীর্ঘশ্বাস ভরা কাহিনী।

শেষ